সন্দীপন পাঠশালা

—কিশোর সংস্করণ—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা
ভারতী ভবন

সন্দীপন পাঠশালা
কিশোর সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন ১৩৫৪
দাম আড়াই টাকা

"সন্দীপন পাঠশালা" বাংলার, বিশেষ ক'রে পল্লী-বাংলার অবহেলিত শিক্ষক-জীবনের আলেখ্য। বইটিকে কিশোর-মনের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করার বিশেষ সার্থকতা ছিল। নানান কারণে কিছুটা বিলম্ব ঘটলেও অবশেষে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হ'ল। ছোটরা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা বইটি প'ড়ে আনন্দ পাবে শুধু তাই নয়, বইটির ভিতর তারা এমন কিছু পাবে যা একান্তভাবে তাদেরই।

প্রকাশক

সাহিত্যিক অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রীচরণেষু—

বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য মহাস্থবির,

আমাদের স্নেহময় বুড়োদা,

তোমার মত স্নেহময় সত্যকারের দাদা জগতে দুর্লভ। তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
১৫-১-৪৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতারামের বাবা বরাবরই বলে, উপরের দিকে তাকিও না। নীচের দিকে চেয়ে দেখো। তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা ভাল, কত লোক তোমার চেয়ে বেশি মান-সম্মান পায়, সে হিসেব করতে যেও না। তার চেয়ে তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা খারাপ, তোমার চেয়ে মানে-সম্মানে দীন কতজন আছে, তারই হিসেব ক'রে দেখ। সুখ না-হোক, শান্তিতে দিন কাটবে তোমার।

কথাগুলি সীতারামের অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তবুও সে সব কথা সে মানতে পারছে না। বাপ রমানাথ বললে, বাবা, আমরা সদ্‌গোপ চাষী, আদ্যিকাল থেকে পিতিপুরুষের কুলকম্ম হ'ল চাষ। এই চাষ ক'রেই আমরা খেয়ে-প'রে ছেলেপুলেকে জমিজমা দিয়ে হরি ব'লে চোখ মুজে আসছি। সেই সব ছেড়ে তুমি—। চুপ ক'রে গেল রমানাথ। ডান হাতে খুরপি চালিয়ে সে একটি নেবুর চারার গোড়ার ঘাস ছাড়াচ্ছিল, বাঁ হাতে হুঁকো ধ'রে তামাক খাচ্ছিল। ছেলেকে কথাগুলি বলবার সময় দুইই বন্ধ ছিল, এখন কথাটা মাঝখানে অসমাপ্ত রেখেই সে আবার দুইই আরম্ভ করলে।

সীতারাম মাথ হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ আবার দুইই বন্ধ ক'রে রমানাথ মুখ তুলে বললে, কি? বল, 'রবিপ্যায়টা' (অভিপ্রায়টা) বল?

সীতারাম এবার বললে, যা হোক একটা চাকরি যখন মিলেছে, তখন আমি দেখব চেষ্টা ক'রে।

রমানাথ আক্ষেপ এবং শ্লেষ দুই মিশিয়ে বললে, কপাল তোমার! চাকরি তো পেটভাতা আর চার টাকা মাইনে। আজ দশ বছর ইস্কুলের মাইনে বোর্ডিংয়ের খরচ জুগিয়ে, শেষে চার টাকা মাইনে আর খোরাক, তাও পোশাক নাই। লেখাপড়া না ক'রে যারা চাকর-খানসামার কাজ করে তারাও তোমার খোরাক-মাইনের ওপরে পোশাক পায় বাবা।

সীতারাম নীরবে বাপের সান্নিধ্য থেকে মাথা নীচু ক'রেই চ'লে গেল এবার।

ছেলের চ'লে যাওয়ার মধ্যেই রমানাথ তার জবাব পেলে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার আপনার কাজে লাগল। হঠাৎ তার এতক্ষণে নজরে পড়ল, কথা বলার অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন সে চারাটির বেশ একটি মোটা শিকড় কেটে ফেলেছে।

মোড়লদাদা রয়েছেন নাকি?—এসে দাঁড়াল তাদের গ্রামের আট-আনা রকমের জমিদার-বাড়ির পুরানো এবং বিশ্বস্ত চাষের তদ্বিরকারক কর্মচারী কানাই রায়। এই কানাই রায়ই সীতারামের চাকরি স্থির করেছে। সেই তাকে প্রলুব্ধ করছে। তাকে দেখে রমানাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, ব'লে উঠল, আপনি আমার এ শত্রুতা কেনে করছেন, বলুন দেখি?

শত্রুতা!—বিস্মিত হয়ে গেল কানাই রায়।

শত্রুতা বইকি। রমানাথ বললে, একটি মাত্র সন্তান আমার। মা-মরা ছেলে মানুষ করেছি বুকে ক'রে। লেকাপড়া ক'রে আজ চার বছর কাছছাড়া হয়ে রইল, তাও বলি, ঝক মারুকগে, ছেলে পড়তে চাইছে, পড়ুক। ফেল যে করবে, তা আমি জানতাম। তা বলি মিটুক, শগই

মিটুক। সেই ফেল ক'রে বাড়ি এল। ভেবেছিলাম, যাক, ছেলের সাধ মিটল, এইবার ঘরে এসে বসবে থির হয়ে। আমার ডান হাত হবে, চাষবাস দেখবে। বিদ্ধ হয়েছি, কাছে কাছে থাকবে। তা না, এ তুমি তাকে কি বুদ্ধি দিলে বল দেখি?

রায় এমন অভিযোগ প্রত্যাশা করে নাই। সীতারামকে সে ভালবাসে, সেই প্রীতিবশতই সে তার মনের অভিপ্রায় বুঝে এই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।

রমানাথ এবার চোখ মুছে বললে, হঠাৎ যদি ম'রে যাই, তবে হয়তো পুত্তের আগুন মুখে জুটবে না।

রায় এবার না হেসে পারলে না। বললে, এই তো আড়াই মাইল পথ গো, এ আবার দূর কি? সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের পড়িয়ে খেয়েদেয়ে তো রোজ বাড়ি আসতে পারবে। আপনার মাথা ধরলে খবর পাঠালে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি আসবে।

রমানাথ এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। নীরবে মাটির দিকে চেয়ে এক গুছি ঘাসের গোড়া ধ'রে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

রায় তাকে বুঝিয়ে বললে, আপনি অমত করবেন না। সীতারামের এতে ভাল হবে, আপনারও ভাল হবে। আট-আনা রকমের জমিদারের বাড়ির ছেলেদের মাস্টার হবে সীতারাম, তাতে—

রমানাথ তার হাতটা ধ'রে হঠাৎ বললে, সেরেস্তার কাজকম্ম যাতে শেখে, তাই যেন ক'রে দেবে ভাই।

রায় বললে, তা আর এমন কঠিন কি! সময়-অবসরে যদি সেরেস্তায় নায়েবের কাছে বসে, তবে ক'দিন লাগবে শিখতে? তা বলব আমি রাণীমাকে।

হ্যাঁ। বাবুদের গোমস্তাগিরি যদি পায় আমাদের গেরামের, তবে,

খাতির বল খাতির, দশ টাকা রোজগার, আর ধর গিয়ে তোমার বাড়িতে থাকা, সবই হবে।

সীতারাম এসে দাঁড়াল।

আমি যাচ্ছি বাবা।

রমানাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, 'যাচ্ছি' বলতে নাই, 'আসি' বলতে হয় বাবা। চল, ফোঁটা-পুষ্প দি, ঠাকুরদের সব পেরণাম কর। চল।

চাষী সদ্‌গোপের গ্রাম।

মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাঁশ অথবা কাঠের খুঁটি দেওয়া দাওয়া, গোবরে মাটিতে নিকানো উঠান, খিড়কিতে ডোবা, ডোবার চার পাশে শাকের আড়া, লাউ-কুমড়ার মাচা, তার পাশে খামার এবং গোয়াল, খামারে ধান-খড়, গোয়ালের সামনে সারিবন্দী গরুগুলি বাঁধা থাকে। পুরুষেরা পরে সাত হাত লম্বা দু হাত চওড়া তাঁতের মোটা কাপড়, কাঁধে থাকে গামছা; মেয়েদের পরনে ন হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি তাঁতের মোটা কাপড়। ভোরে উঠে গো-সেবা করে মেয়েরা। পুরুষেরা মাঠে যায়। ছেলেরা দশ-বারো বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করে, তারপর তারা চাষের কাজে সাহায্য করে কর্তাদের। বেশি লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন হয় না জীবনে। কোন রকমে মোটা মোটা আঁকা-বাকা হরপে নাম সই করতে পারলেই হল। দলিলে সাক্ষী হতে হয়, তা ছাড়া বিপদে আপদে হাণ্ডনোট-তমসুদে সই করতে হয়। এই পর্যন্ত লেখাপড়া কাজে লাগে জীবনে। আর জোর চিঠিলেখা। তাদেরই মধ্যে যারা একটু ভাল শেখে, তারা সন্ধ্যের সময় সুর করে রামায়ণ অথবা মহাভারত পড়ে, অন্য সকলে শোনে। এই চিরাচরিত প্রথায় চলে আসছিল তাদের পুরুষানুক্রমিক জীবন। দুধে-ভাতে না হোক, মোটা ভাত-ডাল এবং খাটো মোটা কাপড়-গামছার অভাব এতে কোনদিন হয় নাই। হঠাৎ একটা কেমন নতুন ঢেউ এল। এই তেরো শো সাল সেটা নিয়ে এসেছে। আড়াই

মাইল দূরে ভদ্রজনের গ্রাম, রত্নহাট। রত্নহাটে হল এক মাইনর ইস্কুল। রমানাথের দাদা হঠাৎ একদিন তার বড় দুই ছেলেকে রত্নহাটের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এল। বড় ছেলে মাইনর পর্যন্ত প'ড়ে আজকাল এই গ্রামেই পাঠশালা করেছে, সে আর হাল ধরে না। মেজো ছেলে পাস করতে পারে নাই, সে কিছু করেও না, হালও ধরে না, টেরি কেটে কামিজ গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর পাঁচ সাত বৎসর পরে রত্নহাটেই হল বড় ইস্কুল—এইচ. ই. স্কুল। এর পর গাঁয়ে যেন হিড়িক পড়ে গেল। রমানাথের বড় দাদার সেজো ছেলে ওই বড় ইস্কুলে ভর্তি হল। ছেলেটি ভাল। ভাল ক'রে পাস করে সে কলেজে পড়ছে। রমানাথও সীতারামকে ভর্তি করে দিয়েছিল ইস্কুলে, কিন্তু সীতারাম থার্ড ক্লাসের পর আর অগ্রসর হতে পারলে না। ফেল হল সেই বৎসরই, রমানাথ হঠাৎ একদিন তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিলে। কারণ ছিল। ওপাড়ার মহাদেব পালের ছেলে চণ্ডী সীতারামের বয়সী এবং পড়তও সীতারামের সঙ্গে। সে সীতারামকে ছাড়িয়ে আরও এক ক্লাস উপরে উঠে আটকে ছিল। তাকে একদিন এক হাতে একটি ফুল ঘুরিয়ে, অন্য হাতে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে গান গাইতে দেখলে রমানাথ। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের বাইরে একটি গাছতলায় বসে সন্ধ্যার আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে সে গান গাইছিল, "সমুখে রাঙা মেঘ করে খেলা"। অবাক হয়ে গেল রমানাথ। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিছুদিন পরেই তার জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়িতে গোলমাল শুনে গিয়ে দেখলে, জ্ঞাতি ভাই বল্লভ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, তার ছেলে ঈশ্বর বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ঈশ্বরও সীতারামের বয়সী। সে ফিফ্‌থ ক্লাসেই আটকে আছে আজ কয়েক বৎসর। আগের দিন জামা কাপড় নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল বাপের সঙ্গে। রাত্রেই কখন বাক্স ভেঙে একমুঠো টাকা—পঞ্চাশ টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে।

বল্লভ বলেছিল, ইস্কুলে ছেলে যেন আর পড়িও না কেউ।

রমানাথের ভাল লেগেছিল কথাটা। বাড়ি এসেই সে সীতারামের পড়া ছাড়িয়ে দিয়েছিল। সীতারাম অবশ্য ওদের মত নয়। সে আজও মোটা কাপড়-জামাতেই সন্তুষ্ট, জুতোর দরকার তার আজও হয় নাই, মাথার চুল সে সমান করেই কাটে। কোন নেশাও সে করে না,—রমানাথের হুঁকো-তামাক আজও নড়ে নাই। তবুও সে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠল, বললে, আর পড়তে হবে না, চাষবাস দেখ।

সীতারাম চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোন প্রতিবাদ করলে না। দু দিন পর হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে রমানাথ চমকে উঠল। বাইরের গুনগুন শব্দে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সীতারাম বাইরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে গুনগুন ক'রে গান গাইছে, "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল—সকলি ফুরায়ে যায় মা"। রমানাথ আরও আশ্চর্য হয়ে গেল সীতারামের চোখে জল দেখে। চাঁদের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, জ্যোৎস্নার ছটা প'ড়ে চোখের কোণ থেকে চিবুকের প্রান্ত পর্যন্ত জলের ধারা দুটি চকচক করছে। বুকটা তার টনটন ক'রে উঠল। সীতারাম তার মায়ের জন্য কাঁদছে! নিজের চোখেও জল এল তার। ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে এসে সে ছেলের মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

কিছুক্ষণ পর তার চমক ভাঙল, চৌকিদারের ডাকে। রাত্রি দুপহর পার হতে চলেছে। ছেলেকে সে বললে, আয়, আমার ঘরে শুবি আয়। চিরদিনই সীতারাম শান্ত ও বাধ্য। সে প্রতিবাদ করলে না, নিজের ঘরের মাদুর এবং বালিশটা নিয়ে বাপের কাছে এসেই শুলে।

সস্নেহে রমানাথ এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করলে, মাকে তোর স্বপন-টপন দেখেছিলি নাকি?

সীতারাম কোন উত্তর দিলে না।

রমানাথ কিছুক্ষণ পর আবার প্রশ্ন করলে, তোর মা কিছু বললে ?

সীতারাম তবুও চুপ ক'রে রইল।

রমানাথ বললে, ঘুমো। স্বপন মানুষ দেখে। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তোকে নিয়েই তো আমার সংসার। তোর মুখের দিকে তাকিয়েই তো আমি চুপ ক'রে থাকি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তুই কাঁদলে আমি বুক বাঁধি কি ক'রে, বল্ ? সে উঠে এসে ছেলের বিছানার পাশে ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ঘুমো।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল, কিন্তু ঘুম তার এল না, সে কথা রমানাথের বুঝতে দেরি হ'ল না। সে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। এবার সীতারাম হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিয়ে বললে, না, আমাকে দিন।

রমানাথ পাখাটা দিলে না এবং সীতারামের কথার জবাব পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠল। সেই উৎসাহের মধ্যে হঠাৎ সে সান্ত্বনার উপায় খুঁজে পেলে, বললে, এই বছরই তোর বিয়ে দোব আমি।

সীতারাম চমকে উঠল, উঠে বসল। বললে, না।

না ! রমানাথ আশ্চর্য হয়ে গেল। না – কি ? বিয়ে করবি না কি ? এ কি অসম্ভব কথা !

না। আমি পড়ব।

পড়বি ? রমানাথ স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে রইল অন্ধকারের মধ্যেই। এতক্ষণে সব তার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল'—হরি হরি, পড়ার সাধ-আশা ! রমানাথ উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল, বললে, বেশ, তাই পড়বি। এখন ঘুমো।

সীতারাম বললে, আমি হুগলিতে নর্মাল পড়ব।

হুগলিতে? চমকে উঠল রমানাথ। হুগলি যে অনেক দূর! তা ছাড়া এখানে পড়া ঘরের ভাত খেয়ে হয়, সেখানে খরচ।

মাসে বারোটা টাকা হ'লেই হবে আমার।

রমানাথ জবাব দিলে না। পাশ ফিরে শুল।

পরদিন রমানাথ সকালে উঠেই রান্না চড়ালে। সীতারাম উঠতেই বললে, ভাত নামিয়ে নিস। আমি মাঠে চললাম। খেয়ে—তাই ইস্কুলেই যাস। এই ভাবেই তার বিপত্নীক সংসার চ'লে আসছিল। সে ডাল নামিয়ে একটা তরকারি রান্না ক'রে ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাঠে চলে যেত, সীতা পড়ত, পড়ার মধ্যেই ভাতটা নামিয়ে ফেলত। বাপের জন্য ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে জ্যেঠাদের বাড়ি চাবি রেখে ইস্কুলে যেত। ফিরত বেলা পাঁচটায়। রত্নহাট আড়াই মাইল পথ। সেদিন অপরাহ্ণে সীতারাম ফিরল ছটায়। রমানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সকল ছেলে ফিরল, সীতা ফিরল না। তার ভয় হ'ল, সর্বাগ্রে সে বাক্স-প্যাঁটরা দেখলে। বাক্স ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে বল্লভদাদার ছেলে ঈশ্বরার মত পালাল না তো? না, বাক্স-প্যাঁটরা ঠিক আছে। কিন্তু তবুও মন মানল না। ঈশ্বরার মত বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে না পালাক, এমনই এক-কাপড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে তো পারে। কাল রাত্রেই তো সে কাঁদছিল আর গাইছিল—'সাধ না মিটিল'। রমানাথ গ্রামের বাইরে পথের উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সীতা ফিরল, তার সঙ্গে রত্নহাটেরই এক পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত বললেন, মণ্ডল মশাই, সীতারাম আমাকে ধরেছে, ও নর্মাল ইস্কুলে পড়বে। আপনার মত আমাকে করিয়ে দিতে হবে।

রমানাথ কি বলবে খুঁজে পেলে না।

পণ্ডিত বললেন, ইংরিজি ও ভাল পারে না, নর্মাল পড়লে ওর ভাল হবে।

রমানাথ এবার বললে, সে তো হুগলিতে পড়তে যেতে হবে।

হ্যাঁ, এই হুগলিতে। আজ চিঠি দিলে কাল চিঠি যায়। সকালে চড়লে বেলা বারোটায় পৌঁছানো যায়। এ আর দূর কি?

রমানাথ চুপ ক'রে রইল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সীতা দাওয়ার এক কোণে বসে কাঁদছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, তাই হবে।

রমানাথ তাই করলে। এক মুখ হাসি নিয়ে সীতারাম বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে হুগলি যাত্রা করলে।

পণ্ডিত মশাইটি হেসে বললেন, সীতারাম আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। চন্দ্র-সূর্যের মত পারবে না—তবে মাটির প্রদীপের মত পারবে।

রমানাথ শুষ্ক হাসি হাসলে, কোন জবাব দিলে না। নীরবে ছেলেকে রত্নহাট স্টেশনের এক ধারে ডেকে নিয়ে বললে, একটি কথা কিন্তু আমাকে দিতে হবে। এইবার তোমার বিয়ে দোব আমি। 'না' বললে হবে না।

সীতারাম মাথা নীচু ক'রে বললে, বেশ।

তারপর তিন বৎসর কেটেছে। শেষ পরীক্ষায় সীতারাম ফেল হ'ল।

সে আবার নতুন করে শুরু করলে। সব কিছু ভুলে প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে এবার সে শুধু পড়েছে, পড়েছে আর পড়েছে।

কিন্তু এবারও সে ফেল হ'ল। ব্যর্থতার সংবাদ এল চিঠিতে।

পরীক্ষায় ব্যর্থতার খবর সীতারাম মাথা হেঁট ক'রে গ্রহণ করলে। আর সে কাঁদে না। রমানাথ গোপনে কাঁদলে। ছেলের পড়াশুনার জন্য খুব বেশি কামনা তার ছিল না, তবে সীতা পড়ে-শুনে একজন খুব পণ্ডিত লোক হোক, এমন কল্পনা করতে তার ভাল অবশ্যই লাগে এই পর্যন্ত। দাদার সেজো ছেলে বি. এ. পাস ক'রে এম. এ. পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে

ওকালতিও পড়ছে। দাদাকে তার ভাগ্যবান মনে হয়, ওই ছেলেটিকে —কিশোরকৃষ্ণকে দেখেও তার মন খুশিতে ভ'রে ওঠে, বাইরে দশ জনের কাছে কিশোর তার ভাইপো—এ অহঙ্কারও করে,মধ্যে মধ্যে মনেও হয় সীতা যদি নর্মাল না প'ড়ে এখানকার পাস দিয়ে অন্তত একজন মোক্তারও হ'ত, তবে ভাল হ'ত। এও সত্য, তবুও এ নিয়ে যে একটা অনির্বাণ দাহময় আকাঙ্ক্ষা, তা তার নাই। শান্ত সরল মানুষ রমানাথ। বিপত্নীক হয়ে ওই সীতারামের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশেই সে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই। বিবাহের কথা ভাবতে গেলেই প্রথমেই মনে হ'ত, সে তো এ বাড়িতে তার সীতারামের মা হয়ে আসবে না, সৎমা হয়ে আসবে। অন্তরে অন্তরে সে হয়তো তার অকল্যাণ কামনা করবে। সভয়ে শিউরে উঠে সে বিবাহের কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলত। বুকে ক'রে সীতাকে সে মানুষ করেছে, সীতা তার কাছে অহরহ চোখের সম্মুখে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে, এইটাই তার সবচেয়ে বড় কামনা। তাই লেখাপড়া শিখে সীতা চাকরি করতে বিদেশে যাবে, এই কাল্পনিক বিরহের আশঙ্কায় তার লেখাপড়ার সার্থকতার দিকটা বরাবরই খাটো হয়ে এসেছে। সীতা কতবার বলেছে, নর্মাল পাস ক'রে কাব্যতীর্থটা যদি পাস করতে পারি, তবে হাই ইস্কুলে হেড পণ্ডিতের চাকরি একটা পাবই।

রমানাথ নীরবে পুড়ুৎ পুড়ুৎ শব্দে নিজের হুঁকোটিতে টান দিয়ে যেত।

প্রসঙ্গক্রমে সীতারাম তুলত চাকরিস্থানে বাসার কথা। বলত, ছোটখাটো বাসা করা যাবে। আপনি থাকলে আমি নিশ্চিন্তি, দু বেলা দুটো ছেলে পড়ালে বিশ-পঁচিশ টাকা আসবে। আপনি সংসার দেখবেন, আমার ভাবনা কি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমানাথ বলত, বাড়ি ছেড়ে কি আমার যাওয়া চলে বাবা? জমি-জেরাৎ, গরু-বাছুর, ধান-পান, চাষ-বাস, নবান-লক্ষ্মী—

সীতারাম এ সমস্যার সমাধান ক'রে দিত অতি সহজে।—কেন? জমি-জেরাৎ ভাগে দেবেন, গরু-বাছুর পালনে দেবেন, ধান-পান বছরে একবার এসে বেচে দিয়ে গেলেই হবে। নবান্ন-লক্ষ্মী, এ আপনার যেখানে থাকব, সেইখানেই হবে।

রমানাথ ঘাড় নাড়ত, না না না। তা হবে না। ভিটেতে দু বেলা সন্ধ্যে পড়বে না। তা ছাড়া—। একটু চুপ ক'রে রমানাথ মনে মনে ভাবত, তারপর বলত, বাবা, আমার জমি অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতে সোনা ফলানো জমি হয়েছে। ডাকলে রা কাড়ে। উ-হুঁ। আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলত, তুই বরং বউমাকে নিয়ে বাসা করবি। আমি কালে-ভদ্দে যাব, দেখে আসব।

সীতারাম চুপ ক'রে থাকত এর পর। তারপর বলত, তা হ'লে বাড়িতেই সব থাকবে। আমি আসব ছুটি-ছাটায়। আপনি না গেলে বাসা ক'রে কি করব?

রমানাথের চোখে জল আসত, সে একটু বেশি জোরে টান দিত হুঁকোয়। তামাকের ধোঁয়ায় আপনার মুখের সামনে ধূম্রজালের সৃষ্টি করত।

সীতারাম আবার বলত, রত্নহাটে যদি কাজ পাই, তবে তো কোন কথাই নাই। বাড়ির খেয়ে চলবে। যেমন খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে পড়তে যেতাম, তেমনই চলবে আপনার।

রমানাথ হেসে বলত, এখানকার ইস্কুলে কাজ দেবে না বাবা। দেবেও না, আর নেওয়াও, ইয়েকে বলে, মানে, ঠিক নয়। রত্নহাটির বাবুরা আমাদিগে 'চাষা' বলে। উহুঁ—না, না, না। তার চেয়ে বিদেশ বিভূঁয়ে ভাল।

এ সমস্ত কথাই মনে হ'ল রমানাথের, তাই সে গোপনে কাঁদলে। সীতারামকে দেখে কিন্তু তার ভয় হ'ল। সে শুকনো চোখে ব'সে রয়েছে।

রত্নহাটের ডাকঘর থেকে নিজেই চিঠিখানা নিয়ে এসেছে, নিজেই বলছে, এবারও পাস করতে পারি নাই বাবা।

দিন তিনেক পরে রমানাথ বললে, সীতা, বাবা, ঘরে ব'সে চাষ-বাস দেখ। বউমাকে নিয়ে আসি। যা আমার আছে, তাতে তো তোর কিছু অভাব হবে না। পড়া তোর ভাগ্যে নাই। নইলে চেষ্টার তো কসুর করিস নাই তুই, আমি তো জানি। আর পড়া—। রমানাথ কথাটা শেষ করতে সাহস পেলে না।

সীতারাম বললে, নাঃ, আর পড়ব না।

রমানাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেসে বললে, মুখ্যু তো বলতে পারবে না কেউ তোকে!

সীতারাম হাসলে। বাবার এ সান্ত্বনায় তার চোখ ফেটে জল এল, তাই সে হাসি দিয়ে সেটাকে ঢাকতে চেষ্টা করলে। পরমুহূর্তে সে উঠে চ'লে গেল।

একটা কামনার অস্থিরতায় সীতারাম অস্থির হয়ে উঠল ক্রমশ। যে কামনার পথ রুদ্ধ হওয়ায় একদিন রাত্রে সে 'সাধ না মিটিল আশা না পূরিল' গান গেয়েছিল, যে কামনার অস্থিরতায় সে হুগলি পড়তে গিয়েছিল, সেই কামনার অস্থিরতা। শেষে সে সেই চাষীতে পরিণত হবে? রত্নহাটের বাবুরা বলে, চাষা। কেউ কেউ বলে, চাষো।

এই গ্রামের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে জমিদারের নায়েব একদিন বলেছিল অনেকদিন আগে, তার স্পষ্ট মনে আছে, বলেছিল, চাষাসে বিনা দাতা নেহি, বিনা জুতাসে দেতা নেহি।

সীতারাম আবার উঠে দাঁড়াল শক্ত পায়ের উপর ভর দিয়ে। বাপকে না বলেই চারিদিক খুঁজতে আরম্ভ করলে শিক্ষকতার কাজ। নর্মাল পাস করেও সে যা করত, তাই করবে সে।

তারপর সে রমানাথের কাছে নিয়ে এল এই প্রস্তাব। রত্নহাটে

তাদের গ্রামের আট-আনা রকমের জমিদারের বাড়িতে দুটি ছেলেকে পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন, দু বেলা খাওয়া আর বেতন চার টাকা। সীতারাম কদিন ধরে চারিদিক ঘুরেছে। একদিন গিয়েছিল বিপ্রহাট। বিপ্রহাট এখান থেকে চার মাইল দক্ষিণে। সেখানে একটা মাইনর ইস্কুল আছে। দিন দুই গিয়েছিল অভয়াপুর। রত্নহাটি তাদের গ্রাম থেকে আড়াই মাইল উত্তরে, রত্নহাটির আরও সাত মাইল উত্তরে অভয়াপুর। অভয়াপুরেও একটা মাইনর ইস্কুল আছে। কোথাও কিছু হয় নাই। সীতারাম শুকনো মুখে বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ দেখা হল কানাই রায়ের সঙ্গে। কানাই রায় সমস্ত শুনে এই প্রস্তাব করলে। সীতারাম দ্বিধা করলে না, গ্রহণ করলে। দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে, দু বেলা খাওয়া আর চার টাকা বেতন। রমানাথ জানে, ওই চার টাকা বেতনও সে নিয়মিত পাবে না, হয়তো পুরোও পাবে না। জমিদার-বাড়ি প্রজার ছেলের বিয়ের সেলামী গ্রহণ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। তবু মানবে না সীতারাম। সে দু বেলা বাবুদের ছেলেদের পড়াবে, আর দশটা থেকে চারটে বাবুদের ঠাকুর-বাড়িতে ছোট ছেলেদের জন্যে একটা লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা খুলবে। মাইনে ছেলে-পিছু চার আনা। তাতেই বা ক টাকা হবে? আর রত্নহাটের বাবুদের বাড়ির জমিদারি—এই সদ্‌গোপ গাঁয়ের ছেলেকেই কি তারা মাস্টার পণ্ডিত বলে খাতির করবে?

সীতারামই জানে।

রমানাথ বলেছিল, পাঠশালাই যদি করবি তো গেরামেই কর্ না কেন?

সীতা বলেছে, জ্যেঠার ছেলে জাঠতুত ভাই, বড় দাদা, গোবিন্দ দাদা—সে পাঠশালা করছে, আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করব?

সীতারাম কিছুতেই মানবে না।

শেষ পর্যন্ত খেয়ে-দেয়ে রোজ বাড়ি আসবে এবং জমিদারী সেরেস্তার কাজ শেখার ব্যবস্থা হবে—কানাই রায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় রমানাথ আর আপত্তি করলে না।

একখানি রামায়ণ, কৃষ্ণের শতনাম, লক্ষ্মীর পাঁচালি, এই নিয়ে একটি দপ্তর রমানাথ ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিলে। তুলসীতলার মৃত্তিকা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফোঁটা দিলে কপালে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে একশো আটবার কৃষ্ণনাম জপ ক'রে সর্বাঙ্গে তিনবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ভগবানের নাম করে যাত্রা কর বাবা। পাপ কিছু ক'রো না, উঁচু দিকে চেয়ো না। ঠোঁট তার কাঁপতে লাগল।

সীতারাম প্রণাম করলে।

আবার একবার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে রমানাথ বললে, রোজ রাত্তিরে বাড়ি আসবে। লণ্ঠন নিয়ে আসবে, আর একটি লাঠি।—বলে সে নিজের যৌবনের সহচর—বাঁশের লাঠিগাছটি ছেলের হাতে তুলে দিলে।

সীতারাম যাত্রা করলে। গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠের ওপারেই রত্নহাটের দালানকোঠা দেখা যায়। বড়লোকের গ্রাম। শিক্ষায় দীক্ষায় সভ্যতায় বাবুরা বিশিষ্ট। সীতারাম বাল্যকালে ওই ইস্কুলে পড়েছে। তারপরও বহুবার গিয়েছে। তবুও ওই গ্রামের বিচিত্র লোকগুলিকে দেখে বিস্ময় তার কাটে নাই। শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা ভয়ও যেন হয়। ভয়ও শুধু নয়, ওদের প্রতি ঘৃণাও যেন আছে। বাবুরাও তাদের ঘৃণা করে, সে কথা তারা প্রকাশ করে অসঙ্কোচে। বলে, চাষা। অসঙ্কোচে বলে, তোমরা তো জাতে চাষা।

তার অন্তরের ঘৃণা সে প্রকাশ করতে পারে না। তাদের মধ্যে সে চলল। সেইখানে থাকতে হবে তাকে।

ভয় সে করে না। কিসের ভয়, কাকে ভয়, কেন ভয়? অন্যায় সে করবে না, কারও অন্যায় সহ্যও সে করবে না।

স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে সে মাঠের পথে এগিয়ে চলল রত্নহাটের দিকে। হঠাৎ মনে হল, আগেকার যাওয়া আর আজকের যাওয়ায় কত প্রভেদ!

দুই

মস্ত বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আধা শহর। সে দুদিকেই—ভিতর এবং বাহিরে দুদিকের রূপেই।

রত্নহাটে ঢুকে গ্রামের মুখেই সীতারাম একবার থমকে দাঁড়াল। সামনেই মণিলালবাবুর বাড়ি। মণিলালবাবু কাছারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছেন। তাঁর ছোট ভাই ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে একখানা বাইসিকেলের সিটে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও যাবার মুখে বোধ হয় কিছু বলছেন দাদাকে।

কানাই রায় বললে, কি, দাঁড়ালে যে?

সীতারাম পিছন ফিরে নিজের গ্রামের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। তাল, শিরীষ, আম এবং বাঁশ বনের ঘন নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে বসতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কানাই রায় আবার বললে, চল।

সীতারাম আবার একবার নিজেকে সংযত এবং দৃঢ় করে নিলে, বললে, চলুন।

মণিলালবাবুর কাছারির সামনে এসে তার বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। মণিলালবাবুকে এখানে 'জাঁদরেল লোক' বলে থাকে। কথায়বার্তায়, চাল-চলনে সবেই তিনি বিশিষ্ট। সীতারামের মনে পড়ল,

বাপের উপদেশ। তা ছাড়া কানাই রায় আগেই হেঁট হয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে তাঁকে প্রণাম জানালে, সীতারামও অনুরূপ ভঙ্গীতে প্রণাম করলে। সীতারামের ভাগ্য, মণিলালবাবু তাদের প্রণামটা আমলে আনলেন না। তারা পার হয়ে গেল মণিলালবাবুর কাছারি। কিন্তু খানিকটা আসতেই মণিলালবাবুর ছোট ভাই ডাকলেন, কানাই রায়, ওহে!

আজ্ঞে।

শোন এদিকে।

কানাই ফিরল, সীতারাম দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কানাই ডাকলে, সীতারাম, শোন, বাবু ডাকছেন।

সীতারাম এসে দাঁড়াল।

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে মণিলালবাবু বললেন, রমানাথ মোড়লের ছেলে তুমি? নর্মাল পাস করেছ। বাঃ! কি নাম তোমার?

সীতারাম সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে, আমার নাম সীতারাম পাল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ! ভাল। নর্মাল পাস করেছ তুমি। ভাল, ভাল। বাবুদের ছেলেদের পড়াবে? বেশ বেশ। তোমাদের গ্রামে লেখাপড়ার বেশ ঢেউ উঠেছে, না?

চুপ করে রইল সীতারাম।

মণিবাবুর ছোট ভাই বললেন, হ্যাঁ, এর এক জাঠতুত ভাই, কিশোরকৃষ্ণ পাল বি. এ. পাস করে এম. এ. আর ল পড়ছে। কিশোরেরই আর একটি ভাই এবার ম্যাট্রিক দেবে। সে ছেলেটিও ভাল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ বেশ বেশ। খুব ভাল। ম্লেচ্ছ-বিদ্যায় তো ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, সবারই অধিকার। তোমরা লেখাপড়া শেখ, মানুষ হও। তোমাদের জাতের একটা দুর্নাম আছে মুখ্যু বলে, সেটা ঘুচাও তোমরা।

একটা অদম্য উচ্ছ্বাসে সীতারামের বুকটা ভ'রে উঠল। চোখ ফেটে জল এল তার। সে আশঙ্কা করেছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষভরা আচরণ। এমন সস্নেহ আচরণ, এমন অকৃপণ প্রশংসা সে প্রত্যাশা করে নাই। সেই অপ্রত্যাশিত উদার ব্যবহারে তার অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে সে মণিলালবাবুকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবুর মুখে অভিজাতসুলভ হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, তুমি কাঁদছ ?

সীতারামের চোখে জল এসেছিল, সেই জল তাঁর পায়ের উপর ঝরে পড়েছে। উত্তপ্ত স্পর্শ থেকে অনুমান করে নেওয়া মণিলালবাবুর মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

সীতারাম অপ্রতিভের হাসি হেসে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না। তারপর সে মণিবাবুর ছোট ভাই ননীবাবুকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তার অন্তরের উচ্ছ্বাসের কথা। তাঁরও ভাল লাগল এটুকু এবং এই উচ্ছ্বাসের স্পর্শে তাঁরও মধ্যে ঈষৎ ভাবস্পন্দন জেগে উঠল বোধ হয়। তিনি বললেন, আমাদের গ্রামে ইস্কুল,—ভদ্রলোকের গ্রাম, ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে না। ইস্কুল হওয়া অবধি দুটি ছেলে বি এ. পাস করেছে, আর কেউ এণ্ট্রান্স পাসই করতে পারলে না। তা তোমরা শেখো, তোমরা বড় হও।

হঠাৎ সীতারাম হাত জোড় করে বললে, আমি নর্মাল পাস করেছি কে আপনাকে বলেছে জানি না। আমি পরীক্ষা দিয়েছি দুবার, পাস করতে পারি নাই।

মণিলালবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন এবার।

সীতারাম বললে, আমি তা হলে যাই।

মণিলালবাবু বললেন, ভাল হবে তোমার। আমার সঙ্গে এর পর দেখা ক'রো।

সীতারাম ভাগ্যকে মানে। সকল সুখ এবং দুঃখের নিয়ন্তা হিসাবে তাকে ভয় করে, ভক্তি করে। আপন ভাগ্যকে সে বার বার প্রণাম জানাল। আজকের দিনটির জন্য এত তৃপ্তি, এত আশ্বাস, এত আনন্দ সঞ্চয় করে সে রেখেছিল!

মণিলালবাবুর ওই আশীর্বাদ, স্নেহপূর্ণ ব্যবহারই সব নয়, আরও সে পেলে। তার কর্মস্থল, তাদের আট-আনা রকমের জমিদার-বাড়িতে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে তার স্যুটকেসটি রাখলে। এ কাছারি সে আগে দেখেছে। আগে এসেছে এখানে। তখন জমিদারবাবু বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন ভয়ানক রাশভারী লোক। বিষয়ী লোক ছিলেন তিনি, কিন্তু কুটিল পন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিরোধ বাধলে তিনি যা করতেন, ব'লে করতেন, এবং অন্যায় যারই হোক ও যেখানেই হোক প্রতিবাদ করতেন।

আজ কর্তা নাই, নাবালকের সংসার, বড় ছেলেটি ভয়ানক উগ্র স্বভাবের, সে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। সীতারামের সৌভাগ্য, তাকে পড়াতে হবে না। পড়াতে হবে ছোট দুটিকে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো এই রক্ত! এ বাড়ির মালিক এখন রাণীমা। সীতারামের ভরসা, তিনি নাকি বড় ভাল লোক।

স্যুটকেসটি রেখে ঘরখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। বেশ ঝকঝকে তকতকে মাঝারি আয়তনের ঘর। আসবাবের মধ্যে কেবল একখানি তক্তাপোশ, আর একটি পুরানো আমলের টেবিল।

কানাই রায় বললে, এই ঘরে তুমি থাকবে। এখন চল, হাত পা মুখ ধুয়ে নাও, রাণীমাকে প্রণাম ক'রে আসবে।

কাছারির একেবারে গায়েই বেশ বড় পুকুর, জলও বেশ ভাল, বাঁধানো ঘাট। পুকুরটিও বাবুদের। সব মিলিয়ে ভালই লাগল সীতারামের।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে দুটো দরজা পার হতে হয়। দরজা দুটির মাঝখানের স্থানটুকু এমন যে সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরের কথা শোনা যায়, কিন্তু দেখা কিছু যায় না। বাড়ির ভিতর বেশ একটি গোলমাল উঠছে। কানাই রায় থমকে দাঁড়াল, কি হ'ল? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলে অত্যন্ত মৃদুস্বরে এবং শঙ্কার সঙ্গে।

সীতারাম শুনতে পেলে, বাড়ির ভিতর ছেলেমানুষের গলায় কেউ বলছে, আমি চোরও নই, চুরি করতেও আমি যাই নি। ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিলাম, দেখলাম ও পাড়ার ছকু কড়ি আরও কজন ছেলে ক্ষেতের মধ্যে সন্ধ্যের অন্ধকারে মুলো আর বেগুন তুলছে। জিজ্ঞাসা করলাম তো ছকু বললে, আমরা ফিস্ট করব রাত্রে, তাই তরকারি চুরি করছি। আমিও ওদের কতকগুলো আলু তুলে দিলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল, কেন দিলে?

উত্তর হ'ল, ওদের সাহায্য করলাম। আর চুরি কখনও করি নি, চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, কিন্তু সকালবেলায়, ওই চাষীটি যদি তোমাকে না দেখত, তা হ'লে তো নিশ্চয় গাল দিত, কোন্ হারামজাদা আমার মুলো-বেগুন চুরি করেছে! গাল দিলে তো দোষ দিতে পার না তুমি! এই বর্ষায় অসময়ে ও কত কষ্টে মুলো-বেগুন লাগিয়েছে।

ভারী পুরুষের গলায় কেউ বললে, থাক্ মা, থাক্। ছেলেমানুষ ক'রে ফেলেছেন।

ছেলেমানুষ বলবেন না নায়েববাবু, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে, ষোল বছর পার হতে চলেছে, ছেলেমানুষ কিসের?

কানাই রায় বিস্ময়ে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সীতারামের

উপস্থিতি সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়েই ব'লে উঠল, রাণীমা বড় বাবুকে বকছেন।

ছেলেমানুষের গলায় এবার কথা শোনা গেল। সীতারাম বুঝতে পারলে, এইটি সেই উগ্র স্বভাবের বড় ছেলেটি। সীতারাম শিউরে উঠল, ছেলেটি অনায়াসে ব'লে গেল, চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম! এবার সে কি উত্তর দেয় শুনবার জন্য সীতারাম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ছেলেটি বলছে সে শুনলে, হ্যাঁ, আমার অন্যায় হয়েছে, তার জন্য আমি ওর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তারপরই সে অন্য কাউকে বললে, আমি দোষ করেছি, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিব্রত কণ্ঠস্বরে বোধ হয় চাষাটি ব'লে উঠল, আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে না। আমাকে বললে, আমি নিজে তুলে দিতাম আপনাকে।

রাণীমা আবার বললেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে পাঁচ সের আলুর বাজার-দরে দাম দিয়ে দেবেন। দামটা নবুর জলখাবারের টাকা থেকে কাটা যাবে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সীতারাম। এ কোথায় এসে পড়ল সে। এদের এই ধারা-ধরন এই রীতি-নীতি তার কাছে শুধু বিস্ময়করই নয়, গম্ভীরতায় শ্বাসরোধী ব'লে মনে হচ্ছে তার। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে ওরই মধ্যে কোথায় একটা এমন কিছু নিহিত আছে, যা ইঙ্গিতে তাকে শাসন করছে। সে যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেল।

নায়েববাবুর গলা শোনা গেল, এস হে এস।

পদশব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কানাই সচেতন হয়ে উঠল মুহূর্তে, এমন লুকিয়ে কথা শোনা তার অভ্যাস আছে। সে গলা ঝেড়ে শব্দ ক'রে আগমনবার্তা জ্ঞাপন ক'রে বললে, এস, এস। এ তো তোমাদের জমিদারের বাড়ি, আপন বাড়ি হে। এস লজ্জা কি?

নায়েববাবু বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে একটি নিম্নশ্রেণীর চাষী। সীতারাম বুঝলে, এরই জমি থেকে আলু চুরি করেছে এ বাড়ির বড় ছেলেটি, পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, চুরি করতে কেমন লাগে!

কানাই নায়েববাবুকে বললে, এইটি আপনার—আমাদের রমানাথ দাদার ছেলে, সীতারাম। মায়ের কাছে নিয়ে যাই?

নায়েব কিছু বলবার আগেই রাণীমা বেরিয়ে এলেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে যেন আপনি কিছু বলবেন না। ও আমার আছে নালিশ করে নি। আমি খবর পেয়েছি অন্য লোকের কাছে। সে দেখেছে ওদের আলু তুলতে, সেই আমাকে ব'লে গিয়েছে।

মায়ের কথা শেষ হবামাত্র কানাই বললে, সীতারাম এসেছে মা।

এইটিই সীতারাম? এস, এস বাবা, বাড়ির ভিতরে এস।

সীতারাম অবাক হয়ে এই মা'টিকে দেখছিল। দেহবর্ণের দীপ্তিতেই তাঁর সকল অবয়ববৈশিষ্ট্য যেন ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কৃশকায়া দীপ্তগৌরবর্ণা মধ্যবয়সী এই মা'টিকে দেখে মনে হয়, যেন জ্বলন্ত একটি শিখা। চোখ দুটি বড় নয়, কিন্তু ওই দীপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রখর। বিপরীত শুধু কণ্ঠস্বরটি, অতি মিষ্ট। সীতারামের মন যেন অভয় পেলে তাঁর কণ্ঠস্বরে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করলে তাঁকে।

* * *

রাণীমা নয়, মা! সীতারামের মনে হ'ল, রাণীমার চেয়ে অনেক বড় উনি—শুধু মা। মা বললেন, ওরে সীতারামকে বসতে আসন দে।

সীতারাম বাড়ি ঢুকে সর্বাগ্রে খুঁজছিল সেই উগ্র এবং বিচিত্র প্রকৃতির বড় ছেলেটিকে। কই সে? তার উগ্র প্রকৃতির কথা সে শুনেছিল, তার উপর নিজের কানে তার অদ্ভুত কথা শুনে কৌতূহল এবং

শঙ্কার তার আর সীমা ছিল না। অপরিসীম শঙ্কিত কৌতূহল। "চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।" এ কি ছেলে? কই সে? কিন্তু সে নাই, বোধ হয় উপরে গিয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ আসনের কথা শুনে সে প্রায় চমকে উঠল, আসন সে প্রত্যাশা করে নাই। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে, হাত পা ঘামছে। আত্মসম্বরণ ক'রেও সে বিব্রত এবং লজ্জিত না হয়ে পারলে না। ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, মা। আসন কি জন্যে? আসন চাই না। আপনার সামনে—

তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই কানাই রায় ব'লে উঠল, ঠিক কথা, আপনার সামনে আমরা কি আসনে বসতে পারি মা? আপনার অন্ন খাচ্ছি, তা ছাড়া প্রজা।

মা হাসলেন, আশ্চর্য স্নেহমধুর কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে বললেন, না না, রায়, এ বাড়িতে সীতারাম আজ এসেছে শ্যামু-দেবুর শিক্ষাগুরু হয়ে। এ বাড়িতে অন্নও আমরা দয়া করে দেব না, উনিই দয়া ক'রে গ্রহণ করবেন। জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ আলাদা। সীতারাম, আসনে উঠে ব'স বাবা।

সীতারামের মনের মধ্যে সে এক আশ্চর্য আলোড়ন উঠল মুহূর্তে। তার স্পষ্ট কোন রূপ নাই, কিন্তু একটা আবেগ আছে, সে আবেগ তাকে একটা মর্যাদাময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করলে, সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। সে আসনটা টেনে নিয়ে বসল।

মা চ'লে গেলেন, ব'লে গেলেন—ব'স, আমি আসছি।

সীতারাম বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে এতক্ষণে। জমিদার হ'লেও ছোট জমিদার, ধনী বলা চলে না, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, ঘরদোরও অবস্থানুযায়ী। কতকটা অংশ পাকা দালান, কতকটা মাটির কোঠা। মাটির হ'লেও কোঠাগুলি পাকা ঘরের মতই দেখতে। থামওয়ালা বারান্দা, পাকা মেঝে, পরিপাটি মাটির পলেস্তারার উপর পাকা ঘরের মত চুনকাম করা। উঠান, দাওয়া এগুলিও সবই পাকা।

কানাই হেসে কাউকে বললে, এস দেবুদাদা, তোমার মাস্টার মশাই। এস।

সীতারামের চোখে পড়ল সামনের বারান্দায় একটি থামের আড়াল থেকে ফুটফুটে একখানি মুখ উঁকি মারছে। তার চোখে চোখ পড়তেই সে ফিক ক'রে হেসে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

সীতারাম তাকে সস্নেহে ডাকলে, এস খোকাবাবু, এস।

ঠিক এই সময়েই মা এসে দাঁড়ালেন। নিজে হাতে নিয়ে এসেছেন একখানি রেকাবিতে দুটি মিষ্টি—দুটি গুড়ের নাড়ু, এক গ্লাস জল। নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তুমি ওদের 'বাবু' ব'লো না বাবা।

তারপর বললেন, খাও, জল খাও। প্রথম এলে, সকলের আগে মিষ্টিমুখ কর। ওই একটু মধু আছে, ওইটুকু আগে মুখে দাও। সীতারামের এতক্ষণে চোখে পড়ল, এক পাশে একটু মধু রয়েছে।

কোন সঙ্কোচ প্রকাশ না ক'রেই সে রেকাবিটি তুলে নিলে। মধুটুকু খেয়ে সে সন্দেশ একটি তুলে নিলে। দোকানের তৈরি নয়, বাড়ির তৈরি। কিন্তু এমন চমৎকার মিষ্টি সীতারাম কখনও খায় নাই। মুখে রেখে গিলতে যেন ইচ্ছা হচ্ছিল না, খেলেই তো ফুরিয়ে যাবে, আর তো মাত্র একটি!

মা ইতিমধ্যে ছেলেটিকে এনে সীতারামের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।—তোমাদের মাস্টার, নমস্কার কর।

ছেলেটি মায়ের রঙ পেয়েছে, মুখখানিও বড় মিষ্টি, শুধু চোখ দুটি বড় প্রখর এবং চঞ্চল, আর শরীরটি বড় হাল্কা, শীর্ণ বলে মনে হয়। সে মুখ টিপে টিপে হাসছিল, সে হাসির মধ্যে তার চঞ্চল প্রকৃতির পরিচয় ফুটে বেরিয়ে আসছে, যেন ফুলের কুঁড়ির সবুজ আবরণের অন্তরালবর্তী তার মুদিত দলগুলির ভিতরের রঙের খানিকটা রেখার মত। চোখে চোখ পড়লেই সে চোখ নামাচ্ছে। তাতে হাসি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মা আবার বললেন, নমস্কার কর।

ছেলেটি এবার চট ক'রে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে কপালে ঠেকালে।

সীতারাম বিব্রত হয়ে উঠল, না না। আমাকে এমন করে প্রণাম করতে নাই। নমস্কার করতে হয়।

মা হেসে বললেন, তা করুক। ওদের প্রণাম নিলেও তোমার দোষ নেই।

সীতারাম বললে, কি নাম তোমার?

ছেলেটি নীরবে অভ্যাসমত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

মা বললেন, বল, নাম বল।

সিরি দেবানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাঃ, ভারি ভাল নাম। তেমনই ভাল ছেলে।

মা হেসে বললেন, ভাল উনি মোটেই নয়। ভারি চঞ্চল। ওকে নিয়ে বেগ পেতে হবে তোমাকে। কিন্তু শ্যামু কোথা গেল? শ্যামু! শ্যামু!

উপরের কোন ঘর থেকে উত্তর এল, এই যে আমি।

কি করছ? নীচে এস।

উত্তর এল, দাদা আমায় কয়েদ করে গিয়েছে।

মা বললেন, তা হোক, তোমার মাস্টার এসেছেন, নেমে এস।

দাদা খালাস না দিলে কেমন করে যাব?

দাদাকে বল। ধীরা।

দাদা নাই।

তা হলে আমি খালাস দিচ্ছি। আমি মা, তোমার দাদারও গুরুজন। আমি খালাস দিলে দাদা কিছু বলবে না।

এইবার দোতলা থেকে বেরিয়ে এল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। এ ছেলেটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখখানি মিষ্টি, কিন্তু একটু গম্ভীর।

মা বললেন, তোমার মাস্টার মশাই, নমস্কার কর।

ছেলেটি ছোট হাত দুটি তুলে বেশ চমৎকার নমস্কার করলে। আড়ষ্ট নয়, চাঞ্চল্য নাই, ধীর এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে নমস্কার করলে।

মা বললেন, ও বড় ধীর, শান্ত। কথা কম কয়।

সীতারাম তাকে কাছে টেনে নিলে। বললে, কি নাম তোমার?

শ্রীশ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কি পড়?

শ্যাম ব'লে গেল, সরল বাংলা পাঠ প্রথম ভাগ, সহজ পাটিগণিত, শিশু ভূগোল পাঠ, ইতিহাসের গল্প প্রথম ভাগ, সচিত্র লিখনপ্রণালী, আর দাদা পড়তে দিয়েছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'।

ওরে বাপ রে, তুমি যে অনেক বই পড়!

শ্যাম অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে বললে, হ্যাঁ।

বাঃ, খুব ভাল ছেলে।

ছোট দেবানন্দটি সম্ভবত দাদার সমাদর দেখে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিল। সে এবার এগিয়ে এসে বললে, আমিও কবিতা জানি, বলতে পারি। বলব? ব'লেই সে আরম্ভ ক'রে দিলে সম্মতির অপেক্ষা রাখলে না, হাত-পা নেড়ে চমৎকার ব'লে গেল—

"নামটি আমার গদাধর, সবাই বলে গদা,
সারা দিনটা রোদে টো-টো গায়ে ধুলো কাদা,
দাদা বললে, গাধা তুই—লিখবি পড়বি নে?
অমনি আমি কেঁদে দিলেম—এঁ-এঁ-এঁ-এঁ।"

চোখে হাত দিয়ে সে এঁ-এঁ ক'রে চমৎকার কান্নার অভিনয় ক'রে গেল। সীতারাম এবং সকলেই হাসলে সে ভঙ্গী দেখে। আরও উৎসাহিত হয়ে দেবু আবৃত্তি ক'রে গেল—

"দিদি বললে—না না না না, তুমি ভাল ছেলে,
সোনা মানিক এস খানিক—হাডুডুডু খেলে।"

ব'লেই সে চোল, চোল, মারা হাডু-ডু-ডু-ডু-ডু ব'লে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল বাড়ি থেকে।

মা শ্যামুকে বললেন, তুমি কিছু শুনিয়ে দাও।

শ্যামু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল দেবুর সাফল্যে। সে সীতারামের কোলের কাছ থেকে স'রে এসে দাঁড়াল, একটি নমস্কার করলে, তারপর বললে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রার্থনাতীত দান"—

"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল,
সুহিদগঞ্জে রক্তবরন হইল ধরণীতল।"

অবাক হ'য়ে গেল সীতারাম। সুন্দর আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে! এমন আবৃত্তি সীতারাম নিজে করতে পারে না। আর কবিতাটিও কি সুন্দর! নর্মাল ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ানো হয় না। এখানকার ইস্কুলে যখন সে পড়ত, তখনও হ'ত না। তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, সে কথা সীতারাম জানে। কিন্তু তাঁর কবিতা বিশেষ সে পড়ে নি। অথচ এই ছোট ছেলেটি!

শ্যামু শেষ করলে আবৃত্তি—

"তরুসিং কহে, করুণা তোমার হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা।"

তারপর সে বললে, শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্ম পরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়। এ তথ্যটিও সীতারামের পক্ষে নূতন। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক মুহূর্তে মনে হ'ল, এদের সে কেমন ক'রে পড়াবে?

হাসিটি যেন মায়ের সহজাত, তিনি হেসে বললেন, ধীরা শিখিয়েছে এসব ওদের। ধীরানন্দকে চেন তো? আমার বড় ছেলে।

সীতারামের কণ্ঠতালু যেন শুকিয়ে গেল। ধীরানন্দ পরিচয়-বৈচিত্র্যে

তার কাছে প্রায় এ বাড়ির কতাবাবুর কাছাকাছি ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে। সে ঢোঁক গিলে বললে, না।

মা ডাকলেন, ধীরা!

শ্যামু বললে, দাদা সাহিত্যসভায় লেখা দিতে গিয়েছে।

মা শ্যামুকে বললেন, যাও, মাস্টার মশাইকে নিয়ে যাও।

একা ঘরের মধ্যে ব'সে সে ভাবছিল। ভাগ্য তার আজকের দিনটিকে অপর্যাপ্ততায় ভ'রে দিয়েছে, অপরূপ এবং অদ্ভুত অপর্যাপ্ততায়। অন্যদিকে কিন্তু ভয়ে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

এদের এখানে কেমন ক'রে সে পড়াবে!

বাড়ি ফিরে যাবে?

সেও ইচ্ছা হয় না।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। ভাবলে।

না, ভয়ে সে পালাবে না। শিখে নেবে সে। কতদিন লাগবে শিখতে? এখানে সে অনেক শিখতে পারবে। ঘরে অবশ্য তার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। কিন্তু তাই কি সব? ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলে—চাষী সদগোপের ছেলে সে, তার লেখাপড়া শেখাই হ'ত না, ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করত, চাষে খাটত। অথবা এমনই ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। ভাগ্য ভাল হ'লে বড় জোর কানাই রায়ের মর্যাদা পেতে পারত। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় বহু ব্যর্থতার মধ্যেও সেই অবস্থা থেকে সে উত্তীর্ণ হয়েছে, হোক সামান্য লেখাপড়া, কিছু শেখার ভাগ্য তার হয়েছে, তখন সে ওই জীবনে ফিরে যাবে কেন?

এই যে আজ জমিদার-বাড়িতে, সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরে শিক্ষাগুরুর আসন সে পেলে, সে আসন উপেক্ষা ক'রে উঠে যাবে সে ভীরুর মত?

না। যাবে না সে।

কিছুক্ষণ পর তার কি খেয়াল হ'ল, পকেট থেকে পেন্সিল বার ক'রে তক্তাপোশের গায়ে যে জানালাটি, তার মাথার উপর লিখলে, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। আজকার তারিখ।

আজকের দিনটি তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। তার পিতৃপিতামহের গ্রাম, পিতৃপুরুষের কুলকর্মের গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে সে আজ ভদ্র-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম এই রত্নহাটে—তাদের গ্রামেরই জমিদার-বাড়িতে শিক্ষকরূপে সসম্মানে আসন পেয়েছে। এ কি কম গৌরবের কথা! অনেকক্ষণ চুপ ক'রে সে ব'সে রইল। এই ক্ষুদ্র সার্থকতাটুকুর উপর ভিত্তি ক'রে সে ভবিষ্যত জীবনের কল্পনার দেউল গড়তে লাগল। বাবুদের বাড়ির এই চাকরিটুকু নিয়ে থাকলে তো তার চলবে না। মাসিক চার টাকায় সে জীবন কাটাতে পারবে না। তা ছাড়া দেবু শ্যামু বড় হ'লে তখন তার কি হবে? অবশ্য ওই বড় ছেলেটির ততদিন বিয়ে হবে হয়তো ছেলেও হবে। অবশ্য হবে। দেবু-শ্যামুর পর সে তাদের পড়াতে পারবে। তারপর শ্যামুর সন্তান হবে, তারপর দেবুর সন্তান হবে। কল্পনাটা বড় বেশী মিষ্টি মনে হ'ল। এ যেন ওই বাড়িতে দাসখত লিখে দেওয়া—মাস্টারির দাসখত। তার চেয়ে সে যদি এখানে একটি পাঠশালা করতে পায়!

পাঠশালার কথা সে কানাই রায়কে বলেছে। কানাই রায় এ বাড়ির মাকে বলেছে। মা আশ্বাস দিয়েছেন তিনি চেষ্টা করবেন। পাড়ার ঠিক মাঝখানে এদের চণ্ডীমণ্ডপ। সেইখানে পাঠশালার স্থান ক'রে দেবেন বলেছেন। কিন্তু--। কিন্তু বাবুদের ছেলেরা কি তার কাছে পড়বে—বড় ইস্কুলের পাঠশালা ছেড়ে? সীতারাম ভাবে।

ব্রাহ্মণ-জমিদারদের ছেলে নিয়ে পাঠশালার কল্পনায় সে আশাও পায় না, স্বস্তিও পায় না। মন কেমন যেন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে। বেনেপাড়ায়, সাহাপাড়ায়, কৈবর্তপাড়ায় পাঠশালা হ'লে বড় ভাল হয়। তাদের সে

পড়াতে পারে। তারা যেন এদের চেয়ে অনেক সহজ, অনেক আপনার।

অন্যমনস্কভাবে পেন্সিল বুলিয়ে বুলিয়ে দেওয়ালে লেখা ৮ই শ্রাবণ তারিখটাকে মোটা ডগডগে ক'রে তুলতে আরম্ভ করলে।

তিন

সাত দিন পর।

এই কয়েকদিনের অভ্যাসেই, সীতারামের মনের সঙ্কোচ এবং ভয়টা ক্রমশ ক'মে আসছে। এখানকার হালচাল ক্রমশ অভ্যাস হয়ে আসছে। এ বাড়ির মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের ভাল লাগছে। এ বাড়িতে ঢুকেই যাকে তার সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর এবং ভয়ের পাত্র মনে হয়েছিল, যার উগ্র ব'লে খ্যাতি সে বাইরে থেকেই শুনেছিল এবং বাড়িতে প্রবেশমুখে 'দেখলাম চুরি করতে কেমন লাগে' এই বিচিত্র বিস্ময়কর উক্তি শুনেছিল, এ বাড়ির সেই বড় ছেলেটির সঙ্গেও তার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

প্রথম দিনেই ধীরানন্দের সঙ্গে দেখা হ'ল সন্ধ্যার সময়। মেজো ভাইয়ের মত অবিকল চেহারা। খালি গায়ে, মালকোঁচা মেরে কাপড় প'রে, ঘামে ভিজে গেঞ্জি গায়ে এসে কাছারির দাওয়ায় উঠে থমকে দাঁড়াল। সীতারাম ঘরে আলো জ্বেলে ব'সে ছিল ছাত্রদের প্রতীক্ষায়। অন্য কেউ ছিল না বাইরের বাড়িতে। ধীরানন্দ এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

আপনি নতুন মাস্টার মশাই ?

মেজো খোকার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখে তাকে চিনতে সীতারামের দেরি হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝতে পারলে না, প্রণাম করবে অথবা নমস্কার করবে, কোন্‌টা করা উচিত!

আমাকে ঘাটে একটু আলোটা দেখাবেন? ফুটবল খেলে এলাম, পা-হাতটা ধুয়ে নিই।

চলুন।

ঘাটে হাত-পা ধুয়ে বললে, তা হ'লে বাড়ির গলিটাতেও একটু আলো দেখান, আমাদের বাড়িতে বেজায় সাপ।

সীতারাম উৎসাহিত হ'ল এবং সহজ আলাপের ধারার মধ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে অনায়াসে ধীরানন্দের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, দাঁড়ান, তা হ'লে আলো নিয়ে আমি আগে যাই।

ধীরানন্দ বললে, গেল বার আমাদের বাড়িতে একদিনে ছত্রিশটা গোখরোর বাচ্চা বেরিয়েছিল।

ছত্রিশটা! বাড়িতে কোথাও বাচ্চা হয়েছিল তা হ'লে।

না। বাড়িতে হয় নি। সবগুলোই প্রায় বাড়ির বাইরে থেকে ভিতরের দিকে আসছিল। রান্না-ঘরেই মারা পড়েছিল ষোলটা, বারদরজায় পাঁচটা, সব বাইরে থেকে বাড়ির দিকে ঢুকছিল। উঠনে তেরোটা। ঘরের ভেতরে কেবল দুটো। একটা ভাঁড়ার-ঘরে, আর সেইটেই অবাক করে দিয়েছিল সকলকে, দালান-ঘরে—দরদালান পার হয়ে লক্ষ্মীর ঘর, তার পেছনে বাসনের ঘর, তার জানলা নাই, একটি শুধু দরজা, দিনের বেলা আলো নিয়ে ঢুকতে হয়, সেই ঘরে গঙ্গাজলের বড় হাঁড়ির মধ্যে কেমন ক'রে গিয়ে পড়েছিল। আচ্ছা, আপনাদের গাঁয়ে সাপ কেমন?

সাপ আছে বইকি।

কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে সাপ কখনও মেরেছেন ?

না। সীতারাম বললে, তবে শুনেছি বটে যে, কার্বলিক অ্যাসিড দেবামাত্র সাপ ম'রে যায়।

দেবামাত্র মরে না। সেবার আমি দিয়ে দেখেছি। কুঁকড়ে অনেক ছটফট ক'রে মরে। ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। তবে গন্ধে সাপ আসে না, এটা ঠিক।

বলতে বলতে তারা বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছিল। ধীরানন্দ হেঁকে বললে, শ্যামু, দেবু, মাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের। মেক হেস্ট।—ব'লেই সে উপরে চ'লে গিয়েছিল।

সে চ'লে গেলে সীতারামের মনে হয়েছিল, বড় চমৎকার লোক তো। কোথায় উগ্রভাষী! বিস্ময়জনকই বা কি আছে এর মধ্যে!

এই সাত দিনের মধ্যে আরও অনেকবার দেখা হয়েছে, বিশ ত্রিশ বার তো হবেই, কথাবার্তাও হয়েছে বার দশেক। ওই এক ধারারই কথা।

ধীরানন্দ সকালবেলা পড়তে যায় এখানকার ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারের কাছে। রাত্রে পড়ে বাড়িতে, বাড়ির ভিতরে উপরে ধীরানন্দের পড়ার ঘর। সেখানে নাকি অনেক বই আছে। ভাল ভাল বাংলা ইংরেজী বই। সীতারামের ইচ্ছা হয়, বই চাইতে। পড়ার ঘরও দেখতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু বলতে পারে নাই। আলাপপরিচয় হয়েছে, বেশ সহজ সরল ভাবেই হয়েছে, কোথাও কোনখানে এতটুকু কাঁটার মত বাধাও ঠেকে নাই। কিন্তু তবু ছেলেটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে ওকে জড়িয়ে ধরবার মত সান্নিধ্যে আসা যায় না।

সীতারামও অগ্রসর হয় নাই। সেও এরই মধ্যে নিজের দৈনন্দিন কাজের একটি বাঁধাধরা ছক তৈরি ক'রে নিয়েছে। রাত্রে বাড়ি যায়। ভোরবেলা তার বাবার সঙ্গেই ওঠে। জামা এবং গেঞ্জিটি কাঁধে ফেলে

ছাতা, লণ্ঠন ও লাঠিটি নিয়ে সে রওনা হয়। রত্নহাট এবং তাদের গ্রামের মধ্যে ছোট একটি নালা আছে, উপরের একটি ঝরনা থেকে জল বারোমাস প্রবাহিত হয়ে নদীর দিকে চ'লে যায়, সেই নালার কাছে এসে জামা গেঞ্জি ছাতা লণ্ঠন লাঠি রেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেয়। নালার দুই ধারে অজস্র বাঘা-ভেরেণ্ডার গাছ, একটি গাছ তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে দাঁতন করে। আরও খানিকটা এসে রত্নহাটের প্রান্তভাগে বহুকালের পুরানো ছায়াঘন যে বটগাছ আছে, তার তলায় এসে গেঞ্জি জামা প'রে নেয়। চাপ দিয়ে দুই হাত বুলিয়ে চুলগুলিকে বসিয়ে আঙুল চালিয়ে বিন্যস্ত করে, কোঁচাটি বার দুয়েক ঝেড়ে নিয়ে আবার রওনা হয়। সাড়ে ছটার মধ্যেই সে এসে বাবুদের বাড়িতে হাজির হয়। ঘরখানির চাবি দুটি, একটি থাকে বাড়িতে, অন্যটি থাকে তার কাছে। ঘর খুলে সে জামা গেঞ্জি রাখে। একটি দেওয়াল-আলনা সে এনেছে বাড়ি থেকে, হুগলিতে কিনেছিল, সেই আলনায় ঝুলিয়ে দেয়। নিজের গাড়ু এবং গ্লাসটি মেজে নেয়। গামছাখানিতে বারকয়েক মুখ মুছে কেচে মেলে দেয়। তারপর ঘরে যে পুরানো আমলের টেবিলটি আছে, সেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ায়। টেবিলটির একটি ড্রয়ার সে নিয়েছে, সেই ড্রয়ারটি একবার গুছিয়ে নেয়। পেন্সিলের কাটা মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাটবার প্রয়োজন থাকলে কাটে, ভোঁতা হয়ে থাকলে সুকৌশলে ছুরি চালিয়ে সূচালো করে। তারপর ছুরিটিতে বার কয়েক শান দিয়ে নেয়, এক টুকরো ভাঙা শ্লেটে। এই সময় আসে শ্যামু এবং দেবু, সদ্য ঘুমভাঙা ফুলো ফুলো মুখে এসে দাঁড়ায়। মায়ের ব্যবস্থায় এবং শৃঙ্খলায় তারা পরিচালিত, মুখ ধুয়েই তারা আসে। সীতারাম তবু নিজের কর্তব্য করে, সে দেখে তাদের দাঁত বেশ ভাল পরিষ্কার হয়েছে কি না, চোখের কোণে পাতায় পিচুটির কণা লেগে আছে কি না। দেখবার সময় সীতারাম ওদের মুখ থেকে সদ্য-লুচি-খাওয়ার দরুন একটা গন্ধ পায়।

এই গন্ধে এবং তাদের গ্রামের আপনাদের ছেলেদের পাটালি-গুড়মুড়ি খাওয়া মুখের সঙ্গে একটা পার্থক্য সে অনুভব করে। যতদিন ছেলেরা দুধ খেয়ে বড় হয়, ততদিন সব ছেলের মুখের গন্ধ একরকম। তারপরই তফাত আরম্ভ হয়।

ছেলেরা পড়তে বসে। কানাই রায় চা নিয়ে আসে বাড়ির ভিতর থেকে, নায়েব খায়, কানাই রায় খায়, সীতারাম কিন্তু খায় না। নিয়মিত খায় না। মাত্র একদিন সে এর মধ্যে খেয়েছে, সেদিন খুব বর্ষা নেমেছিল।

আটটা নাগাদ আসে জলখাবার। সীতারাম জল খেতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু মা শুনবেন না কিছুতেই। তিনি পাঠাবেনই, চাকর নিয়ে আসে—চারখানি রুটি, ঘিয়ে-ভাজা মরিচ-মাখানো চারটি সিদ্ধ আলু, খানিকটা গুড়। সীতারাম রোজই একখানি রুটি, দুটি আলু, এক চামচে পরিমাণ গুড় নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দেয়। আজই অবশেষে একটা রফা হয়েছে, মা সীতারামের ওই একখানা রুটি নেওয়াই মেনে নিয়েছেন।

সীতারাম হাত জোড় করে বলেছে, আর তো দুদিন বাদেই পাঠশালায় বসতে হবে মা, এগারোটার সময়। সাড়ে দশটায় ভাত খেতে হবে। চারখানা রুটি খেয়ে কি আর ভাত খেতে পারব মা ?

চারদিন পর বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতি স্বর্গের দেবতাদের গুরু, স্বর্গের বিদ্যাদাতা তিনি, তাঁর নামাঙ্কিত বারেই পাঠশালা খোলা প্রশস্ত, তা ছাড়া ওই দিন দিনও ভাল আছে। ওই দিনই সীতারামের পাঠশালা বসবে। পাঠশালার জন্য মা অনেক চেষ্টা করেছেন। ফলও অবশ্য কিছু হয়েছে, কিন্তু সীতারাম যা আশা করেছিল, তা হয় নাই।

মা বলেছিলেন, ছোট ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়েই ইস্কুলে ছুটতে হয়, আধ মাইলের বেশি পথ। তুমি যদি পাড়ার মধ্যে

ঘরের দরজায় চণ্ডীমণ্ডপে এগারোটায় পাঠশালা খোল, ইস্কুলের চেয়ে মাইনে কম নাও, তবে সকলেই ছেলে তোমার পাঠশালায় দেবে।

সীতারামের কাছেও এ যুক্তি অকাট্য ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গেল, যুক্তি অকাট্য হ'লেও লোকে যুক্তির ধার দিয়েও গেল না। তারা ইস্কুল ছাড়িয়ে ছেলেদের পাঠশালায় পড়তে দিতে রাজি নয়।

জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ এ পাড়ার প্রবীণা ঝিউড়ি মেয়ে। তিনি সেদিন এই বাবুদের বাড়িতেই মাকে বললেন, সীতারাম উপস্থিত ছিল তখন, বললেন, হাজার হ'লেও ইস্কুলের পড়ায় আর পাঠশালার পড়ায় ধাঁরুর মা? তুমিই বল। কই, তুমি ছাড়াবে ইস্কুল ছেলেদের?

হেসে মা বললেন, আমার ছোট ছেলে ছুটি তো ইস্কুলে পড়ে না ঠাকুরঝি, তারা তো ওর কাছেই পড়ে।

সে পেরাইভেট পড়ে। ছুটি ছেলেকে নিয়ে মাস্টারটি ছু বেলা ঘষে। সে এক, আর তোমার পাঠশালার গোলে হরিবোল এক। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমার ভাইপো তিনটিকে দিতে পারি যদি মাস্টার তোমার ছেলেদের মত পেরাইভেট পড়ায় ছু বেলা। তা তিনজনের জন্যে তিন টাকা দোব। ছোটটি তো ধর পড়ে না—অ-আ আর ক-খ। তার পড়া নামে, আগলানো শুধু। তা তবুও তোমার তিন টাকাই দোব।

এ পাড়ার পতিতপাবনবাবু একজন প্রবীণ এবং মাতব্বর—তাঁকেও মা ডেকেছিলেন, তিনি বললেন, ও তো একটা বালক। শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ও কি জানে? ইস্কুলের পাঠশালা থাকতে আবার পাঠশালা! হুঁ।

এখানকার ইস্কুলের প্রাইমারি বিভাগ ইস্কুলের সঙ্গে নামে স্বতন্ত্র হলেও ইস্কুলেরই একটা অংশ। সেখানে তিনজন মাস্টার আছেন। একজন শুধু প্রবীণ, সে আমলের ছাত্রবৃত্তি পাস, আর দুজনের একজন

ম্যাট্রিক ফেল, অন্যজন নর্মাল পাস। দুজনের একজন সেকেণ্ড মাস্টারের জামাই, অন্যজন হেডমাস্টারের গুরুদেবের ভাইপো। এদের কিন্তু দুজনেরই বয়স কম, এক রকম সীতারামেরই বয়সী। প্রবীণ যিনি তিনি প্রবীণ হয়েছেন ব'লে পাঁচ ঘণ্টা ইস্কুলের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা চেয়ারে ব'সে না ঘুমিয়ে পারেন না।

মা সীতারামকে তবু আশ্বাস দিলেন, হাসি মুখে বললেন, ওঁদের কথায় তুমি দ'মে যেয়ো না বাবা। একটা ভাল কাজে অনেক বাধা আসে।

পরের দিন আবার একটা বাধা এল। সীতারাম খেতে বসেছিল, হঠাৎ একটি মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। কই ধীরুর মা?

কে?—মা বেরিয়ে এলেন।

আমি। দাদা পাঠালে তোমার কাছে।

বাইরে থেকে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, বল, আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

কি, বল?

মহিলাটি গম্ভীরভাবে ব'লে গেলেন, চণ্ডীমণ্ডপের তোমরা অবিশ্যি মোটা শরিক, বারো আনা অংশ তোমাদের—সব সত্যি কথা, কিন্তু তা ব'লে তো যা ইচ্ছে তাই করতে পার না চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ে।

মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কি ব্যাপার?

তিনি বললেন, পাড়ার মধ্যে মাঝখানে দেবস্থান, বউ ঝি এরা সব যায় আসে, এখানে তুমি তোমার স্বামীর নামে নাকি পাঠশালা বসাচ্ছ? এটা কি ঠিক হচ্ছে?

বাইরে থেকে মহিলাটির দাদা এবার হেঁকে বললেন, ঠিক হচ্ছে-টচ্ছে নয়। সে হবে না। সে আমি করতে দোব না। চ'লে আয় তুই।

তিনি চ'লে গেলেন।

সীতারাম বললে, থাক্ মা, যখন এত—। কথা শেষ করতে পারলে না সে।

মায়ের মুখ থমথম করছিল। তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবছিলেন কিছু, হঠাৎ বললেন, আমাদের কাছারির পূর্ব দিকের বারান্দায় পাঠশালা খুলবে তুমি।

সেই দিনই ঠিক সন্ধ্যার মুখে সে গেল ইস্কুল-সাবইন্সপেক্টারের কাছে। রত্নহাটেই একজন সার্কল-সাবইন্সপেক্টার থাকেন। পাঠশালাগুলির তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। সাবইন্সপেক্টার ব'সে ছিলেন বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাসায়। ভালই হ'ল সীতারামের, হেডমাস্টার মশায় তারও এককালের শিক্ষক, তাঁর কাছেও অনুমতি নেওয়া হবে। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে সে, সাবইন্সপেক্টারবাবুকে নমস্কার করলে। তারপর সবিনয়ে তার নিবেদন জানালে।

সাবইন্সপেক্টার বললেন, বেশ, করুন পাঠশালা, চলুক কিছুদিন, বছরখানেক যেতে দিন, তারপর দরখাস্ত করবেন। তখন দেখে শুনে যা উচিত হয় করা যাবে।

হেডমাস্টার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন প্রথম থেকেই, তিনি বললেন, এর জন্য আমায় বলছ কেন তুমি?

আমি আপনার ছাত্র। আমি এখানে পাঠশালা করছি, তাই অনুমতি চাচ্ছি।

অনুমতি তো পারব না দিতে। এখানে আমাদের একটি প্রাইমারি সেকশন রয়েছে। তোমাকে পাঠশালা করবার অনুমতি দিয়ে কেমন ক'রে তার ক্ষতি করতে বলব, বল?

এর উত্তর দিতে পারলে না সীতারাম, শুধু একটু দুঃখিত হ'ল। সেও তো তাঁর ছাত্র। তার মঙ্গল দেখাও কি তাঁর কর্তব্য নয়?

মাস্টার মশায় আবার বললেন, নিজের গ্রামে পাঠশালা করলে না কেন ?

আজ্ঞে, সেখানে আমার জাঠতুত ভাই পাঠশালা করেন।

তবে ? এখানে যে আমাদের নিজেদের পাঠশালা বিভাগ আছে বাপু।

এবার সীতারাম উত্তর দিলে, বললে, আমাদের গ্রাম ছোট, সেখানে কটিই বা ছেলে ! এখানে বড় গ্রাম, কুড়িটা ছেলে হ'লেই আমার পাঁচটা টাকা হয়ে যাবে। আর অনেক ছেলে তো পড়ে না আপনাদের পাঠশালায়, বেশি মাইনে—

তা হ'লে ভদ্রপাড়া ছেড়ে তুমি অন্য পাড়ায় পাঠশালা করবার চেষ্টা কর। হেসে বললেন, দেশের সেবাও হবে। ওদের জুটিয়ে পাঠশালা ক'রে যদি 'অন্ধকার থেকে আলোকে' আনতে পার, তবে একটা কীর্তি থাকবে তোমার।

সীতারাম মর্মাহত হ'ল তাঁর কথার ভঙ্গীতে। সে চ'লে এল সেখান থেকে।

মা আবার পাঠালেন তাকে মণিলালবাবুর কাছে। ওঁকে একবার ব'লে এস। উনি বললে, চণ্ডীমণ্ডপের আপত্তি আর কেউ তুলবে না।

মণিলালবাবুকে প্রণাম ক'রে সে দাঁড়াল। বললে সব। আশ্চর্য ! সেদিনের সে মানুষই নন ইনি, কথার সুরও আলাদা। তিনি শুধু বার কয়েক বললেন, হুঁ। হুঁ। হুঁ। শুনলাম বটে। শেষে নির্লিপ্তের মত বললেন, দেখ, চেষ্টা কর। তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ডাকলেন, চৈতন ! চৈতন !

উত্তর না পেয়ে বললেন, গড়গড়ার কল্কেটা নিয়ে বাইরে কে আছে ? দাও তো হে ছোকরা, আগুন কেটে গেছে, আগুন দিতে বল।

সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু আজ্ঞা পালন না ক'রে পারলে না।

মা শুনে বললেন, মণিঠাকুরপো এমনই অদ্ভুত মানুষই বটেন। যখন যেমন খেয়াল হয় বলেন।

সীতারাম মর্মান্তিক বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেল, হেডমাস্টার মশায়ের কথাটা মনে পড়ল। ভদ্রলোকপাড়া বাদ দিয়ে অন্য পাড়ায় পাঠশালা করলে কি হয়? অনেক ভেবে সে একটি ক্ষেত্রও আবিষ্কার করলে। সাহাপাড়া এবং জেলে-কৈবর্ত-পাড়ায় পাঠশালা খোলার কথা মনে হ'ল।

সাহাপাড়ার ছেলেরা অবশ্য অধিকাংশই লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করে। সাহা অর্থাৎ শৌণ্ডিকেরা সমাজে জল-অচল সম্প্রদায় হ'লেও, আর্থিক অবস্থায় খুব সম্পন্ন শ্রেণী। কুলগত মদের দোকান তো আছেই, তার উপরে এদের আছে মহাজনী ব্যবসা। যে যেমন, তার তেমন কারবার—গহনা বাসন বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। খালাসের একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে, সে সময় পার হ'লেই দেনদারকে জানিয়ে দেয়, ও জিনিস আর তুমি পাবে না। আচারে বেশ-ভূষাতেও ওরা ভদ্র। কিন্তু তবু ইস্কুলে পাঠশালায় ওদের স্থান নীচে। শিক্ষকেরা ওদের ঘৃণার চোখে দেখেন। সীতারামের মনে আছে, তাদের সঙ্গে পড়ত, সাহাদের খুদে আর পচা। মাস্টারেরা ডাকতেন, এই শুঁড়ি!

সীতারামের মনে হ'ল, ওদেরই জন্য যদি সে পাঠশালা করে, তবে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হয়ে তার পাঠশালায় পড়বে।

জেলে-কৈবর্তদের ছেলে অনেক। শীতের দিনে রৌদ্রতপ্ত বটতলায় দোলাই গায়ে দিয়ে এক জায়গায় জ'মে বসে তারা, হি-হি ক'রে হাসে, পরস্পরকে গালিগালাজ করে। ওরা পাঠশালায় যায় না। ওদের অনেকের ধারণা লেখাপড়া শিখতে নাই ওদের। যে শিখবে, সে ম'রে যাবে। অথচ কৈবর্তদের পয়সা আছে—মাছের ব্যবসার পয়সা। ওদের মোড়ল বিপনের একান্ত ইচ্ছে ছেলেকে পাঠশালায় দেবার। কিন্তু

ও পাঠশালায় দুদিন গিয়েই ছেলেটা আর যেতে চায় নাই। কেন যেতে চায় না, সে অনুমান করতে পারে সীতারাম। সে ভয় না থাকলে, ওরাই বা আসবে না কেন?

উঠে বসল সীতারাম। জ্যোতিষ সাহা সাহাপাড়ার মাতব্বর, লোকও ভাল। কৈবর্তরাও সাহা মশায়ের অনুগত। বিপনকে জ্যোতিষ 'কাকা' বলে, বিপন বলে, 'জ্যোতিষ বাবা'।

ওদের কাছেই যাবে সে।

শ্যাম্‌ এবং দেবুকে দশটার সময় ছুটি দিয়ে স্নান সেরে নিলে। স্নান করতে তার খানিকটা সময় লাগে। পুকুরে সে স্নান করে না। এ বিষয়ে তার ইস্কুল-জীবনে দুজন প্রাচীন শিক্ষকের সে অনুগামী হয়েছে। গাড়ুটি হাতে নিয়ে গামছা এবং কাপড় কাঁধে ফেলে সে যায় ঝরনায়। দ্রুতপদে যায়, দ্রুতপদে ফেরে। নিজের ঘরের মধ্যেই একটি দড়ির আলনা টাঙিয়েছে সে। সেই আলনায় কাপড়খানি মেলে দেয়, গাড়ুটি রাখে টেবিলের নীচে। কোন বাক্সভাঙা এক টুকরো বেশ প্লেন কাঠ যোগাড় করেছে, সেটি ঢাকা দিয়ে তার উপর একটি নুড়ি চাপা দেয়, তারপর হুগলিতে পাঠ্যজীবনের অভ্যাসমত বাঁ হাতে আয়নাটি ধ'রে চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়ায়। টেরি কাটে না, সমান ক'রে সামনে টেনে কপালের উপরে চুল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দেয়। একটি টিকি আছে, সেটিকে সযত্নে সামনের দিকের চুলের সঙ্গে টেনে মিশিয়ে বেমালুম মিলিয়ে দেয়। এর পর ভাত খায়। ভাত খেয়েই গেঞ্জি জামা প'রে ছাতাটি হাতে বার হ'ল, গেল সাহাপাড়ার দিকে। জ্যোতিষ সাহা মশায়ের পাকি মদ ও গাঁজা-আফিং-সিদ্ধির দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

জ্যোতিষ আশ্চর্য হয়ে গেল। তার দোকানে রমানাথ মোড়লের ছেলে কেন? ছেলেটি লেখাপড়া শিখেছে, তা ছাড়া ভাল ছেলে ব'লেই তো সকলে জানে তাকে।

একটি নমস্কার ক'রে সীতারাম বললে, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি? বল।

আপনাদের পাড়ায় আমি পাঠশালা করতে চাই। আপনাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা।

জ্যোতিষ সবিস্ময়ে বললে, পাঠশালা!

হ্যাঁ, পাঠশালা।

সীতারাম তার ভেবে-রাখা যুক্তিগুলি সাহাকে জানাল। বললে, ইস্কুলে ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়ে ছুটতে হয়—দেড় মাইল পথ—ভদ্রলোকের বাড়িতে অবিশ্যি দশটায় ভাত হয়, কিন্তু আমাদের মত গেরস্ত বাড়িতে মেয়েদের অসুবিধে হয়। এই ধরুন, আমি এগারোটায় পাঠশালায় আসব। বাড়ির দোরে পাঠশালা—মেয়েরা এক ঘণ্টা সময় পাবে, তা ছাড়া ভাত না হ'ল, মুড়ি খেয়ে পাঠশালায় এল, একটায় টিফিন—দিব্যি এক দৌড়ে বাড়ি এসে খেয়ে আবার চ'লে গেল। হঠাৎ কারও ছেলেকে দরকার হ'ল, হাঁক দিলে—মাস্টার, রামকে একটু ছুটি দাও। হয়ে গেল। তা ছাড়া মাইনেও কম করব আমি, গেরস্ত ঘরে দু আনা পয়সা কম নয়।

এতগুলি যুক্তির অবতারণা ক'রে সে সাহার মুখের দিকে চেয়ে দেখল, কথাগুলি সাহা মশায়ের মনে লাগল কি না। সাহা মশায় ভাবছিল, কথাগুলি তার সত্যই মনে লেগেছে।

সীতারামের আবার একটা কথা মনে এল, বললে, এ ছাড়াও ধরুন, ইস্কুলের মাইনে মাসের সাত তারিখে না দিলে ফাইন লাগে, তারপর মাস শেষ হ'ল, অমনই নাম কেটে দিলে। গরিব গেরস্ত যারা, তারা সব মাসে কি মাইনে ঠিক ঠিক দিতে পারে? পাঠশালাতে সেও একটা সুবিধে, নাম কাটা যাবে না, ফাইন লাগবে না।

এতে সাহা মশায় হাসলেন, বললেন, ফাইন লাগবে না, সেটা সুবিধে

বটে, কিন্তু মাইনে না দিলে মাসের শেষেও যদি নাম কাটা না যায়, তবে, তাতে তোমার সুবিধে হবে না। মাইনে আর কেউ দেবেই না।

লজ্জিত হ'ল সীতারাম, মনে হ'ল, সে যেন কাঙালপনা ক'রে ফেলেছে। নিজেকে সম্বরণ ক'রে সে বললে, তার জন্যে একটা কমিটির মত থাকবে। আপনারা পাঁচজনে একমত হয়ে একটা কমিটি ক'রে দেবেন। আপনি প্রেসিডেণ্ট হবেন। মাসের শেষ আমি খাতাপত্র একদিন দেখাব। আপনারা নাম কেটে দিতে বলেন, দোব।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার সে বললে, অবিশ্যি আমি প্রাণ দিয়ে খেটে পড়াব, মাইনে চাই বই কি আমার। কিছু পাব ব'লেই তো কাজ করতে এসেছি। কিন্তু আমিও তো চাষী গেরস্ত ঘরের ছেলে—গেরস্ত ঘরের দুঃখ বেদনা আমি জানি। আমার দুঃখের সঙ্গে ছাত্রদের বাড়ির দুঃখের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। কেউ যদি এক মাস মাইনে দিতে না পারে, আপনারা যদি দেখেন, মাইনে বাকি ইচ্ছে ক'রে পড়ে নাই, তবে তার নাম কাটব না, থাকবে। আর অভাব যদি সত্যি হয়, তবে থাকবে দু মাস মাইনে বাকি। দেবে পরে। তাও যদি মনে করেন আপনারা যে, বাকি মাইনে ছেড়ে দিলে ভাল হয়, দোব আমি।

সাহার দোকানের সামনেই বাবুদের একটি বাগানওয়ালা পুকুর। সেই পুকুরের জলে তখন বাতাসে ঢেউ উঠেছে, শ্রাবণের বর্ষার উতলা বাতাস। ঢেউয়ের মাথায় সূর্যের ছটা ঝকমক করছে। সাহা সেই দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, আমি ভাই ভেবে দেখি। পাড়ার পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

সীতারাম এইবার শেষ কথা বললে, তা ছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্যে পাঠশালা, বাবুদের ছেলের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাত থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।

জ্যোতিষ চকিত হয়ে মুখ তুললে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তারপর সামনের দিকে ওই আলো-ঝলমল পুকুরের দিকে।

*　　　*　　　*

আরও দু দিন চ'লে গেল।

পাঁচজনকে নিয়ে সেই পরামর্শই চলছে এখনও।

গন্ধবণিকপাড়ায় কয়েকজন ইস্কুলের বন্ধু আছে তার। দু দিন সে তাদের ওখানেও গেল। সেখানে বিশেষ উৎসাহ পেলে না। এদের প্রবীণেরা অত্যন্ত বিজ্ঞ। বললে, আচ্ছা, কর পাঠশালা—দেখি পড়াশুনো কেমন হয়, তারপর দেখা যাবে।

সেদিন বিকেলবেলা হয়ে গেল ছাত্র-বাড়ি ফিরতে। জল খেয়ে অবসন্ন মনেই গাড়ু হাতে নিয়ে গামছাটি কাঁধে ফেলে খালি গায়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এটি তার নিত্যকর্ম। ঝরনার ধারে বেড়াতে যায়। আরও একটি জিনিস থাকে—একখানি আসন, আসনখানি সে বাড়ি থেকে এনেছে। আকাশে মেঘ থাকলে ছাতাটি নেয় বগলে। গ্রাম পার হয়ে চ'লে যায় সেই ঝরনার ধারে। একটা কাঁকর-পাথর-ভরা গাছপালা-শূন্য অনুর্বর টিলার নীচে ঝরনা। সে ওই টিলাটার কোন একটা স্থানে গিয়ে আসনখানি পেতে বসে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব'সেই থাকে। এটুকুও তার সেই পুরানো আমলের পণ্ডিত মশায়ের অনুকরণ। ভাবে ব'সে ব'সে। এ কদিন শুধু ভেবেছে পাঠশালার কথা। পাঠশালা না হ'লে খাওয়াদাওয়া আর চার টাকা মাইনেতে চাকরি সত্যই অত্যন্ত লজ্জার কথা।

বাবা তার এখনও বলছেন, ঘরে ব'সে চাষবাস দেখ বাবা। মা লক্ষ্মীর সেবা কর। "নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন, এই খেয়ে যায় যেন জন্ম জন্ম!" চাষ ছাড়লে চাষ জাহান্নমে যাবে। আমি আর কদিন! এসব হ'ল পিতিপুরুষের কথা।

কথা পিতৃপুরুষের বটে। সত্যও বটে। তার জাঠতুত ভাইয়েরা—ওই কিশোরদের চাষের অবস্থা সত্যই খারাপ হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বড়দাদা মাইনর প'ড়ে পাঠশালা করেছে গাঁয়ে, সে হাল ধরে না, চাষও দেখে না। মেজো চাকরি-চাকরি ক'রে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর এম. এ. আর ল পড়ছে। ছোটকা এবার ম্যাট্রিক দেবে। জ্যেঠা বুড়ো হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। তবুও চাষের ভার সব ওই বুড়োর উপর। কৃষাণের উপর ষোল আনা নির্ভর। ফলে জ্যেঠার ক্ষেতে তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সকলের চেয়ে কম ফসল হয়। কথা ঠিক। কিন্তু বাড়িতে থেকে চাষ নিয়ে থাকার কথা ভাবতে গেলে তার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠে। চাষ করলে আর কি তাকে জমিদার-বাড়িতে বসতে আসন দেবে? ওই মণিলালবাবু সেদিন তাকে কল্কেটা নিয়ে বাইরে দিতে বলেছেন, সে চাষীর ছেলে ব'লে। বললেও, তাকে তামাক সেজে আনতে বলতে পারেন নাই। লেখাপড়া শিখে মাস্টারি করবে শুনেই তাঁকে সেদিন ভালও বলতে হয়েছে। নিজে হাতে চাষ করলে আর কি তিনি এটুকুও বলবেন? এবার তামাক সেজে আনতে বলবেন।

পেটে খেয়ে বেঁচে থাকাই কি সব?

তার চেয়ে পুরানো পণ্ডিত মশায় বলতেন, শূকরেও দিনাতিপাত করে। সমস্ত দিন ঘুরে সেও নিজের উদরপূর্তি করে।

তার বাবা আরও বলেন, বেশ তো, পাঠশালা করলি যদি, তবে গাঁয়ে তোর দাদা করছে, দাদার সঙ্গে লেগে যা। না হয় তোর পাশের গাঁয়ে এই রাধিকাপুরে কর্।

রাধিকাপুর তাদের গ্রামের পাশেই, তাদের গ্রামের মত ছোট চাষীর গ্রাম, করলে অবশ্য হয়। হয়তো মাসে পাঁচ সাত টাকা মাইনে উঠবে। কিন্তু সেও তার মনে ধরে না। রাধিকাপুরের পণ্ডিত মশাইয়ে

আর রত্নহাটের পণ্ডিত মশাইয়ে কি তুলনা হয়! তা ছাড়া ওই যে জমিদার-বাড়ির দুটি ছেলে, ফুটফুটে মুখ, ঝকঝকে চোখ, টপ-টপ কথার উত্তর দেয়, চটপটে ভাব, এসব রাধিকাপুরের ছেলেরা পাবে কোথায়? ওদের মাস্টার মশায় হতে পারায় একটা কত বড় গৌরব! শ্যামুকে আর দেবুকে যদি সে পড়ায়, তারা যদি এককালে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়, তা সে তো বলতে পারবে, শ্যামু-দেবুর মাস্টার সে! শ্যামু-দেবুর একজন যদি জজ হয়, একজন হয় ম্যাজিস্ট্রেট, তা হ'লে? বুকের ভিতরটা তার কেমন করতে থাকে।

সন্ধ্যে হয়ে এল, সে উঠল। ঝরনায় মুখ হাত ধুয়ে গাড়ুটি ভর্তি ক'রে নিয়ে সে ফিরল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভ।—

"অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরমে আঁখি বিরস বদনা
নলিনী।"

তারপর আর ঠিক মনে নাই। স্মৃতিশক্তিটা তার ভাল নয়। তার জীবনের অকৃতকার্যতার এইটাই সবচেয়ে বড় কারণ। সে কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। আবার ফিরল ঝরনার ধারে। কিছু ব্রাহ্মীশাক তুলে নিয়ে সে ফিরল। রান্না ক'রে খাওয়ার তো সুবিধা হবে না, ছেঁচে রস ক'রে নিয়ে খাবে সকালে। হ্যাঁ, আরও আছে, সামনে আসছে ভাদ্র মাস, পিত্তবৃদ্ধির সময়, এ সময় চিরেতার জল অন্তত এক সপ্তাহ খেতে হবে।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই রায় বললে, কি গো পণ্ডিত, ভমন হ'ল নাকি?

কথাটা একটু যেন বিঁধল সীতারামের গায়ে। কানাই রায় যেন

কেমন কদিন ধ'রে বাঁকা কথা কইছে। 'সীতারাম' ব'লে ডাকে না। বলে, পণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত মশায় বলে। বুঝতে পারে সীতারাম কানাই রায়ের মনের কথা। কিন্তু সে কি করবে তার।

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?

বণিক সেই যে কুক্কুটকে বলেছিল—"নহে দোষ তোর মূঢ়, দৈব এ ছলনা, জ্ঞানশূন্য করিল গোঁসাই।" মিথ্যা কথা নয়।

কানাই রায় বললে, কি রকম? কথা বলবে না নাকি?

হেসে সীতারাম বললে, রায়, তোমাকে আমি 'কাকা' বলি, তোমাকে অমান্যি করতে, কি অছেদ্দা করতে কবে দেখেছ বল দেখি?

রায় একটু অপ্রস্তুত হ'ল। না, না, না। --কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব ফুটিয়ে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, জ্যোতিষ সাহা লোক পাঠিয়েছিল। তোমাকে একবার যেতে বলেছে সন্ধ্যেতে।

সীতারাম গাড়ুটি রেখে জামা ও গেঞ্জি টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে গেল।

সাহার দোকানের বারান্দায় একটি গোলমাল হচ্ছে। সীতারাম দোকানের সামনেই থমকে দাঁড়াল। জ্যোতিষ হাত জোড় ক'রে বলছে এই গ্রামেরই বাবুদের ছেলে শিবকিঙ্করকে, আমাকে মাপ করবেন বাবু, আমি হাতজোড় করছি। আমি পারব না। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাতায় ঠিক দিয়েছি, এখন আর দিতে পারব না।

জড়িত কণ্ঠেই শিবকিঙ্কর বললে, আর দিতে পারবে না।

আজ্ঞে না। জোড়হাত করছি আপনাকে।

জোড়হাত করছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ?

জ্যোতিষ এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না।

শিবকিঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জড়িত স্বরে বললে, বেশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

জ্যোতিষের এবার নজরে পড়ল, সীতারাম দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ডাকলে, এস এস। পণ্ডিত এস।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। শিবকিঙ্কর দাওয়া থেকে নামছিল, সে থমকে দাঁড়াল। পণ্ডিত? কে পণ্ডিত? পণ্ডিতে মদ খায়?

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম ক'রে উঠল। কি বলবে সে বুঝতে পারলে না! সাহা মশায় তাড়াতাড়ি বললে, আজ্ঞে না, ওটি আমাদের পাশের গায়ের রমানাথ মণ্ডলের ছেলে সীতারাম, নর্মাল পাস করেছে।

রমানাথ মণ্ডলের ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সীতারাম? সীতারাম মণ্ডল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নর্মাল পাস করেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখানে কি? মদ খায় না তো, হিঁয়া কাহে?

আমাদের পাড়ায় পাঠশালা খুলবে, তাই।

হঠাৎ হাসতে লাগল শিবকিঙ্কর। বললে, মণ্ডল, মণ্ডল! অ্যাঁ? মণ্ডল!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চাষা! চাষা! অ্যাঁ? চাষা পণ্ডিত হয়েছে! অ্যাঁ! চাষা কথাটার 'চ'য়ের উচ্চারণটা অদ্ভুত শ্লেষ-তীক্ষ্ণ, ইংরেজী 'এসে'র সঙ্গে উচ্চারণকে মিশিয়ে এমন ধারালো, এমন তীক্ষ্ণ ক'রে তুলেছে যে প্রতিবার ওই শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সীতারামের অন্তরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে

ব'লে মনে হ'ল। সে সবল যুবা। তার দেহের রক্ত যেন টগবগ ক রে ফুটতে লাগল।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি বললে, ছি, আপনি ভদ্রসন্তান, বাবুলোক, আপনার কি ওই রকম ক'রে কথা বলতে হয়?

শিবকিঙ্কর মত্ত হাসি হেসেই চলেছিল, সে বললে, চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শুঁড়ী ছাত্র? চাষা পণ্ডিত হয়েছে, এইবার শুঁড়ী পণ্ডিত হবে। হে-হে-হে—হে-হে-হে!

সীতারাম এগিয়ে শিবকিঙ্করের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

শিবকিঙ্কর তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলে। কালো চেহারা, পাথরের মত শক্ত শরীর, চোখের দৃষ্টি যেন রাগে জ্বলছে। সে কোন কথা না ব'লে চলতে আরম্ভ করলে। সীতারাম এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যোতিষ বাধা দিলে, থাক্, যেতে দাও।

কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে শিবকিঙ্কর আবার হাসতে শুরু করেছিল, হে-হে-হে—হে-হে-হে!

চার

আকস্মিক একটি ছোট ঘটনা থেকে অঘটন অর্থাৎ যা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না, তেমন ঘটনা অনেক সময় ঘটে। ঘটলে সীতারাম তাকে ভাগ্যের খেলা বলে। শিবকিঙ্করের এই গালি-গালাজ করাটা, ওটা যেন সীতারামের ভাগ্যের খেলা। জ্যোতিষ সাহা কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সীতারামকে বললে, তাই হবে পণ্ডিত। তুমি পাঠশালা খোল।

সীতারাম তখনও আত্মসম্বরণ করতে পারে নাই। সে শিবকিঙ্করের গমনপথের দিকে চেয়ে ছিল রূঢ় পলকহীন দৃষ্টিতে। শিবকিঙ্করকে দেখা যায় না, শুধু অন্ধকার থমথম করছিল। সাহার কথার উত্তরে অবান্তর ভাবেই ব'লে উঠল, শিবকিঙ্করের ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক চাষা শব্দটা নকল ক'রে সে বললে, চাঁষা, চাষা! চাষারা মানুষ নয়! শুঁড়ী, শুঁড়ী!

জ্যোতিষ বললে, শুঁড়ীর দোর না হাঁটলে বাবুদের দিন যায় না। হাসলে জ্যোতিষ।

সীতারাম বললে, আপনি যদি না মাঝখানে পড়তেন, তবে আমি আজ শিক্ষা দিতাম ওকে।

কজনকে শিক্ষা দেবে? জ্যোতিষের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। নিম্নস্বরে বললে, ও না হয় মাতাল। মুখের সামনে বললে। ওই কথা বাবুদের বলে না কে? আমরা জাতিতে সাহা, আচ্ছা, ভাল। আমাদের জল খায় না, আমরা নীচে মাটিতে বসি, ডাকে আমাদের শুঁড়ী বলে। বেশ, দেশের আচার চ'লে আসছে, শাস্ত্রে আছে, বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু আমাদেরই জ্ঞাতি নরেন সাহা ডাক্তারী পাস ক'রে এসেছে, কই, তার ওষুধ—জল-মেশানো ওষুধে তো আপত্তি হয় না? কই, তার বেলা তো এসব কথা বলতে পারে না কেউ? জান, ইস্কুলে তার ছেলেদের মেয়েদের খাতির আলাদা। হঠাৎ জ্যোতিষের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, আমার মনে আছে, ইস্কুলে পড়তাম, পড়াশুনায় ভাল ছিলাম না। একটু থামল সে। থেমে আবার বললে, তা এখানকার বাবুদের ছেলেরাও তো ভাল ছিল না। এই শিবকিঙ্কর, ও তো আমার সঙ্গে পড়েছে। আমরা যা বা পারতাম, ও তাও পারত না। মাস্টারের একটি কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না। আর আমাকে কি বলত জান? বলত, মেয়া-ঘাঁটা শুঁড়ী, মেয়া ঘাঁটাগে যা। পচুই বেচগে যা।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে। তারপর চুপ ক'রে কি যেন

ভাবতে লাগল। বোধ হয় সেই আমলের এই ধরনের অনেক কথা। সীতারামেরও মনে প'ড়ে গেল। ইংরেজী উচ্চারণ তাদের গ্রামের এবং তাদের স্বজাতিদের অধিকাংশ ছেলেদের শুদ্ধ হ'ত না। 'এম'কে 'অ্যাম', 'এন'কে 'অ্যান', 'এল'কে 'অ্যাল', 'এস'কে 'অ্যাস' ব'লে ফেলত তারা। সেকেণ্ড মাস্টার বলতেন, 'অ্যাল' নয় 'এল', 'অ্যাম' নয় 'এম', 'অ্যান' নয় 'এন', 'অ্যাল' নয় 'এল', 'র‍্যাল' নয় 'রেল' বুঝলে? 'এস'টা 'অ্যাস' নয়, অ্যাস তুমি। গর্দভ কোথাকার!

লজ্জিত হ'ত তারা। রসিকতা ক'রে তিনি আবার বলতেন, ভাল ক'রে জিভ ছুলবে, বুঝেছ? পার তো কামারবাড়ির উখো দিয়ে ঘ'ষে পাতলা ক'রে নিও। তারপর শাসন ক'রে বলতেন, এবার যদি 'অ্যাল', 'র‍্যাল' বলবে তো, একটা ব্যাল এনে ঠুকে ঠুকে তোমার মাথায় ভাঙব। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। দিয়ে কুলকর্ম যা আছে করগে যা।

জ্যোতিষ সাহা বললে, তা হ'লে তাই হ'ল। তোমাকে ডেকেছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম, এখন পাঠশালা তুমি বাবুদের ওখানেই কর, আমাদের সব দোনা-মোনা করছে। তুমি আমাকে বলেছিলে বৃহস্পতিবারেই খুলতে চাও পাঠশালা। তাই বলছিলাম, আমি সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি। তা—। মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে সে বললে, না, তা বৃহস্পতিবারে তুমি এই পাড়াতেই পাঠশালা খোল। শুঁড়ীর ছেলে, কৈবর্তের ছেলে পড়বে, চাষা-পণ্ডিতই আমাদের ভাল। হ্যাঁ, তাই ভাল। কথা পাকা।

সীতারাম বললে, দেখবেন আপনি, বছর বছর যদি আমি বৃত্তি নেওয়াতে না পারি, তবে—। কি শপথ সে করবে বুঝতে পারলে না। এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, দেখবেন, আপনি দেখবেন।

পরের দিন থেকে সে পাঠশালা খোলার আয়োজন নিয়ে মেতে উঠল।

এমন উৎসাহটি সে যেন মায়ের সাহায্যে পাঠশালা খোলার প্রস্তাবে পায় নাই। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী পাঠশালার উদ্যোগ-আয়োজনে তার যেন কিছু করবারই ছিল না। সব ব্যবস্থাই হচ্ছিল মায়ের হুকুমে। আর এ পাঠশালার উদ্যোগ সমস্তই নির্ভর করছে তার উপর। সাহা সম্মতি দিয়েছে, কিছু ছাত্র সে প্রথমে সংগ্রহ ক'রে দেবে এবং পাঠশালার জন্যে জায়গাও সেই দেবে। সাহা একটা নতুন খামার-বাড়ি করেছে, সেই খামার-বাড়িতে পাঠশালা বসবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

একখানা চেয়ার চাই, একটা টুল, টেবিলও একটা হ'লে ভাল হয়, বোর্ড —ব্ল্যাকবোর্ড একখানা তো চাই-ই। তা ছাড়া একটা ঘড়ি। দুটো জলের কলসী, দুটো গেলাস, খানকয়েক খেজুরপাতা অথবা তালপাতার চ্যাটাই। কলসী গেলাস এগুলো অবশ্য সামান্য ব্যাপার, অল্প কয়েকটা টাকা হ'লেই হয়ে যাবে। চিন্তা প্রথম কয়েক দফা নিয়ে। এই সব চিন্তায় সে রাত্রে তার ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে উঠেই সে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক দ্রুত পদক্ষেপে রত্নহাটের পথে চলতে আরম্ভ করলে। হয়ে যাবে, কোন রকমে সব হয়ে যাবে। "উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!" চেয়ার টুল পাওয়া যাবে, ও দুটো বাবুদের বাড়ি থেকেই এখন নেবে, শেষ পর্যন্ত মোড়া দিয়েও কাজ চলবে। টেবিল একটা তৈরি করিয়ে নেবে প্যাকিং কেস কিনে। ভাবনা কেবল ঘড়ি আর ব্ল্যাকবোর্ডের। এখানকার যামিনী বাঁড়ুজ্জে ঘড়ি মেরামত করে, দরকার হ'লে নতুন ঘড়িও আনিয়ে দেয়। একটা টাইমপিস তার কাছে কিনলেই এখন চলবে। সাত-আট টাকা হ'লেই হবে। অবশ্য একটা ক্লক হ'লেই ভাল হয়। আধ আধ ঘণ্টায় বাজবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক ঠিক ঘণ্টার আওয়াজ দিয়ে যাবে, ছেলেরা শুনবে এক-দুই-তিন-চার—। জাপানী ঘড়ি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এখন, পনরো-ষোল টাকায় পাওয়া যেতে পারে, টাকা না হয় ধার করবে। তারপর ব্ল্যাকবোর্ড। ভাবতে ভাবতে

এ সমস্যারও সমাধান ক'রে ফেললে সে। খানিকটা কাঁঠালকাঠের তক্তা যোগাড় ক'রে রত্নহাটের পাকা মিস্ত্রি সতীশকে দিয়ে ছোটখাট বোর্ড বানিয়ে নিতে পারা যায়। কাঁঠালকাঠে পালিশ হয় ভাল, ভাল ক'রে পালিশ করিয়ে তার উপর কেরোসিন মিশিয়ে পাতলা আলকাতরার আস্তরণ মাখিয়ে দিলেই চলবে। ফ্রেমের বদলে মাথায় দুটো কড়া বসিয়ে দিয়ে দড়ি বেঁধে দেওয়ালে পোঁতা হুঁকে ঝুলিয়ে দেবে। রত্নহাটে পৌঁছেই সে সতীশ মিস্ত্রির কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। নষ্ট করবার মত সময় কোথায় ? "সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।" যামিনী বাঁড়ুজ্জের কাছে একটা ক্লক-ঘড়িও সে ঠিক ক'রে ফেললে। এর পর হিসেব করলে টাকার। সমস্ত আয়োজন করতে তার লাগবে প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা। তার নিজের যা সম্বল ছিল, তা থেকে চার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে কাঁঠালতক্তা কিনতে। আরও দু টাকা গিয়েছে কেরোসিন, আলকাতরা, লোহার পেরেক, কড়া কিনতে, ডোমেদের কাছে চ্যাটাই কিনতে। সম্বল এখন ছটি টাকা।

স্তব্ধ দুপুরবেলায় বাবুদের বাড়ির ঘরের ভিতর ব'সে ছিল। টাকা ছটি কয়েকবার নাড়াচাড়া ক'রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে স্থির করলে, এখন একটা টাইমপিসই ভাল।

হঠাৎ সে উঠে পড়ল। উপায় সে খুঁজে পেয়েছে। ঘরটি বন্ধ ক'রে একেবারে এসে উঠল কেষ্ট স্বর্ণকারের বাড়ি। নাকের ডগায় ঝুলে-পড়া চশমা প'রে কেষ্ট কাজ করছিল। চশমা এবং ভুরুর ফাঁক দিয়ে সীতারামের দিকে তাকিয়ে বললে, এস পণ্ডিত। আমার ছেলেটাকে তোমার পাঠশালাতেই দোব। বেজায় মোটা বুদ্ধি হে। একটুকু দেখো। ব'স। সামনেই ছিল কয়েকটা মোড়া, কেষ্ট সেই সবগুলোকেই দেখিয়ে দিলে।

সীতারাম নিজের হাত থেকে খুলে দিলে দুটি আংটি, দেখুন দেখি। কত ওজন ? সোনাটা অবিশ্যি গিনি, আমি জানি।

আংটি দুটির একটি দিয়েছিল তার বাবা, অন্যটি পেয়েছিল বিয়েতে।

বিক্রি করবে?

স্বর্ণকার আংটি দুটি হাতে নিয়ে একবার তাকালে সীতারামের মুখের দিকে, তারপর আংটি দুটি হাতের তালুতে নিয়ে ওজনটা অনুভবে অনুমান ক'রে নিয়ে বললে, ভরি দেড়েক, কি ছ আনা, মানে এক ভরি ছ আনা হবে। তারপর সে নিক্তি বার ক'রে ওজন করলে। নিক্তির মাথার সুতোটি সন্তর্পণে তুলে ধ'রে দুটি কুঁচ ফেললে ওজনের দিকে, নিক্তির দাঁড়ি স্থির হয়ে দাঁড়াল। কেষ্ট হেসে বললে, এক ভরি সাড়ে ছ আনা।

আংটি বেচে হ'ল তেত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আজ সে যুদ্ধের বাজারকে ধন্যবাদ দিলে। যুদ্ধ বাধার জন্য দেশের বাজারে প্রায় আগুন লেগে গিয়েছে। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে গত নভেম্বর মাসে, কিন্তু বাজারের আগুন আজও নেভে নাই। সীতারাম নিজেই কত সময় বলেছে, কাল যুদ্ধ। কিন্তু আজ সে সোনা বেচে এতগুলি টাকা পেয়ে যুদ্ধ বাধার জন্য খুশি হ'ল।

টাকাটা নিয়ে সে প্রথমেই গেল অনন্ত বৈরাগীর বাড়ি। বৈরাগী মাথায় ক'রে মনিহারি ফিরি ক'রে বেড়ায়। মালা-ডোর-আয়না-চিরুনি, পুতুল-তেল-সাবান, কিছু কিছু গিল্টির গহনা। সে দেখেছে বৈরাগীর দোকানে কাচের কেসের মধ্যে কালো ভেলভেটের খোপে খোপে হরেক রকমের আংটি থাকে। দুটি আংটি সে বেছে কিনল, অনেকটা তার সেই আংটি দুটির মত। তার বাবাকে সে এ কথা জানতে দিতে চায় না। বাবা দুঃখিত হবেন, রাগ করবেন, তাঁর দেওয়া আংটি সে বিক্রি করেছে। হয়তো বকবেন, বলবেন, লক্ষ্মী ছাড়াবি তুই!

বাবা তো বুঝবেন না তার মনের কথা!

তারপর সে গেল রঘুনাথ রাজমিস্ত্রির বাড়ি। ঠিক ক'রে এল,

কাল সকাল থেকেই সে লোকজন নিয়ে সাহার কামারবাড়িতে যাবে। টুকরো টুকরো মেরামত যা আছে সেরে দেবে এবং কলিচুন দিয়ে ঘরখানা এবং বারান্দাটাকে চুনকাম ক'রে দেবে। রঘুনাথকেই সে কলি-চুনের এবং তুলির জন্য পাটের দাম দিয়ে এল। খানিকটা এসে আবার ফিরে গিয়ে সে বললে, খানিকটা নীল ওর সঙ্গে না দিলে ভাল হবে না। নীলও খানিকটা কিনে নিও।

রঘুনাথ বললে, তা হ'লে চিনিও খানিক দেন্ এর সাথে। নইলে তো ধরে না, গায়ে 'ঘ্যাষ' লাগবে আর উঠে যাবে চুন। টাক-পড়া মাথার মত মাটি বেরিয়ে পড়বে।

তা বেশ। কত লাগবে বল ?

চিনি আপনার আধপো টাক, আর নীল। তা দিয়ে যান আনা চেরেক পয়সা।

আরও একটু ভেবে নিয়ে সীতারাম বললে, আর একটি কাজের ভার নিতে হবে। ঘরের ভার তো তোমার। বাইরে উঠানটিকেও ঝরঝরে ক'রে দিতে হবে। বেশ সমান ক'রে চেঁচে-ছুলে গোবর-মাটিতে নিকিয়ে দিতে হবে। একটি বাড়তি মজুর আর একটি মজুরনী নেবে, কেমন ?

তা বেশ। তাও করিয়ে দোব।

কালকের মধ্যে আমার সব শেষ হওয়া চাই। আজ ধর মঙ্গলবার। কাল বুধবার সব তোমরা শেষ করবে। পরশু দিনই আমার পাঠশালা খোলা হচ্ছে, বুঝছ ?

সে আপনি দেখে নেবেন। বেলা চারটের সময় আসবেন। সব কম্‌পিলিট ক'রে রাখব। না হয়, কানটা ধ'রে আমার ম'লে দেবেন। বাস্।

চারটের সময় পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকল না। ছাত্রদের পড়িয়ে

তাড়াতাড়ি সে স্নান সেরে নিলে পুকুরে। ঝরনা পর্যন্ত যাওয়ার সময় নাই আজ। স্নান সেরে খেয়েই এসে হাজির হ'ল পাঠশালা বাড়িতে। সমস্ত কাজ শেষ করিয়ে সে যখন বার হ'ল, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুনের দাগে ভ'রে গিয়েছে। পা-হাত চুনের তেজে হেজে গিয়েছে। নিজেও সে সমানে খেটেছে রঘুনাথের সঙ্গে! লজ্জা হ'ল তার। জামা, গেঞ্জি, জুতো পুকুরের পাড়ে রেখে সে জলে নেমে পড়ল।

বৈকালে বেড়াতে যাওয়াও হ'ল না। আরও অনেক কাজ বাকি। আজ একটু চা খেলে সে। পরিশ্রম হয়েছে, দুবার পুকুরে স্নান করেছে। খেয়ে-দেয়ে আবার চলল সে। বাবুদের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার গেল,—টুলের বদলে সাহা মশায় একখানা চেয়ার দিয়েছেন। সতীশ মিস্ত্রির বাড়ি থেকে ছোট শেল্‌ফ, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড আনিয়ে, ঠিক দরজার সামনে দেওয়ালের গায়ে রাখাল নিজের চেয়ার, তার সামনে টেবিল, চেয়ারের ডান দিকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে ব্ল্যাকবোর্ড, এ পাশে বড় দুটো হুকে প্যাকিং কেস থেকে তৈরি শেল্‌ফটি বসালে। চেয়ারের ঠিক মাথার উপরে শক্ত ক'রে লম্বা আড়াই ইঞ্চি পেরেক ঠুকে ক্লক-ঘড়িটা বসিয়ে দিলে। দম দিয়ে চালিয়ে দিলে ঘড়িটা। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা এসে জুটেছিল। তাদের উৎসাহেরও অন্ত নাই। তাদের জন্য পাঠশালা হচ্ছে, এইখানে তারা পড়বে। এরই মধ্যে তারা সীতারামকে 'মাস্টা-মশায়' বলে ডাকতেও শুরু করেছে। ঘড়িটা চালিয়ে দিয়ে সে তাদেরই মধ্যে বড় দেখে একজনকে বললে, সাহা মশায়ের দোকানে শুধিয়ে এস তো কটা বাজছে। কটা ক মিনিট ঠিক ঠিক জেনে আসবে।

আর একজনকে বললে, তুমি যাও, ধীরানন্দবাবুদের বাড়ি যাও তো। এই চাবি নিয়ে, কানাই রায় আছে, তাকে দেবে, বলবে মাস্টার মশায়ের লণ্ঠনটা দেন।

তারপর সে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে আরম্ভ করলে। নটা বেজে

রয়েছে। শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যা হয়েছে। এখন অন্তত সাড়ে ছটা পৌনে সাতটা। দশ এগারো বারো ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘড়িটা বেজে চলেছে। সুন্দর আওয়াজ এবং জোর আওয়াজ।

মাস্টার মশাই!

চমকে উঠল সীতারাম। ধীরাবাবুর গলা। সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল চেয়ার থেকে। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার বুকটা আবেগে পূর্ণ হয়ে গেল। আপনি, ধীরাবাবু।

ধীরানন্দই বটে। সে একা নয়, শ্যামু-দেবুও এসেছে, সঙ্গে কানাই রায়ের দুই হাতে দুটি লণ্ঠন। তার মধ্যে একটি সীতারামের।

ধীরানন্দ বললে, দেখতে এলাম আপনার পাঠশালা কেমন হ'ল? শ্যামু-দেবুও এসেছে।

সীতারাম দেবুকে কোলে তুলে নিলে। দেবু হাসি চাপবার চেষ্টায় দাঁতে খামচ কেটে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ধীরানন্দ বললে, বাঃ! বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে!

সীতারাম লজ্জা পেলে অকারণে। তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, পাঠশালা তো!

ধীরানন্দ বললে, পাঠশালার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। বাঃ! ঘড়িটা নতুন দেখছি।

সীতারাম এই মুহূর্তটিতে নিজেই একটা খুঁত আবিষ্কার করলে। এপাশের দেওয়ালে যেমন ঘড়ি রয়েছে, ও মাথার দেওয়ালে তেমনই যদি একখানা ছবি থাকত।

ধীরানন্দ বললে, খুব ভাল হবে। এক দেওয়ালে নয়, তিন দেওয়ালে তিনখানা—স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একখানা—বিদ্যাসাগরের ছবি তো পাওয়া যায় না, একখানা মা সরস্বতীর ছবি দিয়ে দিন। খুব ভাল হবে।

ধীরানন্দের কথাটি ভারি ভাল লাগল সীতারামের। তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে, মনে হ'ল, ছেলেটি যদি ছোট হ'ত! এ যদি তার ছাত্র হ'ত! এমনই না হ'লে ছাত্র!

ধীরানন্দ বললে, এর পর কতকগুলো হাতী ঘোড়া বাঘ গরু মোষ সাপ, এই সব রঙিন ছবি আনাবেন। দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবেন, ছেলেদের ভাল লাগবে।

আবার সে বললে, পাঠশালার কি নাম দিলেন? নাম দিন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই বারান্দার দেওয়ালে মোটা মোটা ক'রে লিখে দিন। না হয় নিজেই তৈরি ক'রে নিন একটা সাইনবোর্ড।

বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সীতারাম। প্রথম দিন বাইরে থেকে ছেলেটির কথা শুনে তার যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এই দশ দিন পর আবার তার কথায় তেমনই বিস্ময় জেগে উঠল।

কানাই রায় বললেন, চলুন দাদাবাবু।

চল। ধীরানন্দ উঠল।—আপনিও আসুন মাস্টার মশায়।

চলুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি। কিন্তু দেবু যে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ধীরানন্দ বললে, ওটা ভারি চঞ্চল, একটু স্থির হ'লেই ঘুমিয়ে যায়। রায়জী, তুমি ওকে নাও।

চ'লে গেল তারা। সীতারাম একা ব'সে রইল। টেবিলের উপর আলোটা তুলে দিলে, চেয়ারে ব'সে অন্ধকার বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। তার পাঠশালা। ছেলেরা কলরব ক'রে পড়বে, সে ব'সে থাকবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, যেখানে যার ভুল হবে সংশোধন ক'রে দেবে। তারা সব লোহার তাল। সে কামার। সে তাদের থেকে নানা ধরনের অস্ত্র গ'ড়ে তুলবে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তার গায়ে ঘাম ঝরবে। সযত্নে পান ধরাবে তাদের ধারের মুখে। বছরে

বছরে ছেলেদের কতক লোয়ার প্রাইমারি পাস ক'রে চ'লে যাবে, আবার ছোটর দল এসে ভর্তি হবে। যারা পাস ক'রে যাবে, তারা বড় ইস্কুলে যাবে, সেখান থেকে যাবে কলেজে। কতজন কৃতী হবে জীবনে। দেখা হ'লে সবিনয়ে সম্ভ্রম ক'রে 'পণ্ডিত মশায়' ব'লে তাকে সম্বোধন করবে। এখানে পড়াতে পড়াতে তার বয়স হবে, প্রৌঢ় হবে, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে, চোখে চশমা নিয়ে চালশে-ধরা চোখে সে তখনও পড়াবে। থাকবে তারা তার চারি পাশে, কলরব ক'রে পড়বে।

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বেজে গেল। অনেক রাত্রি হয়েছে। বাবুদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া চুকবার সময় হ'ল। সে উঠল। আলোটা নিয়ে আবার একবার ঘরখানি দেখলে। তারপর দুয়ারে তালাবন্ধ ক'রে উঠানে নামল।

উঠানে একটি বাগান করতে হবে। ছোট খুরপি কয়েকটা আর দুটো ছোট বালতি কিনবে। ছেলেরা গাছের গোড়া খুঁড়বে, পুকুর থেকে জল এনে গোড়ায় দেবে,—ফুল ফুটে উঠবে, চমৎকার শোভা হবে।

ছেলেদের একটা ফুটবল কিনে দিতে হবে। কয়েক পা গিয়ে মনে হ'ল, ঘড়িটার তলায় দম দেওয়ার দিনটা লিখে দিতে হবে—বুধবার, সন্ধ্যা সাতটা।

নিত্য ভোরবেলা উঠে সে পুণ্যশ্লোকদের স্মরণ করে। বাল্যকাল থেকেই বাবার কাছ থেকে এটি সে শিখেছে। বাবা যা বলেন, ছেলে-বেলায় সে যা শিখেছিল, তাতে ভুল ছিল কয়েকটা। এখন অবশ্য সে শুদ্ধ শ্লোকই বলে। আজ সে প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে শ্লোকটি উচ্চারণ করলে। সরস্বতীর মূর্তি মনে মনে কল্পনা করলে, সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করলে। তারপর সে স্মরণ করলে পুণ্যশ্লোক মহাত্মা মানবদের। রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করলে, বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করলে, বিবেকানন্দকে

প্রণাম করলে। সেই নর্মাল পাস পণ্ডিত মশায়কে স্মরণ করলে, প্রণাম করলে। এখানকার হেডমাস্টারকেও স্মরণ করলে, প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসিনের মূর্তি। তাঁকেও প্রণাম জানিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে সে অত্যন্ত খুশি হ'ল। সামনেই বাগানে ভোরের আবছায়ার মধ্যে একটা বেদীর উপর ব'সে ছিল ধীরানন্দ। আঃ, ভাল লোকের মুখ দেখলে সে। দিন তার ভাল যাবে। আজকের দিন ভাল যাওয়ার মানেই হ'ল তার পাঠশালার ভবিষ্যৎ ভাল হবে। গত রাত্রে সে বাড়ি যায় নাই। সকাল থেকে অনেক কাজ আছে। স্মিতমুখে এগিয়ে এসে সে ধীরানন্দকে বললে, বাঃ আপনি তো খুব ভোরে ওঠেন!

ধীরানন্দ কিছু লিখছে। সে বললে, হ্যাঁ। লিখতেই থাকল সে। সীতারাম এই ছোট্ট উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু ক্ষুণ্ন হ'ল। তবুও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আজ আপনাকে প্রণাম করব।

কেন? প্রণাম করবেন কেন?—মুখ না তুলেই বললে ধীরানন্দ।

আজ আমার পাঠশালা খুলব।

কিন্তু আমি তো কারও প্রণাম নিই না, নিজের লোক, মানে—ভাইবোন ছাড়া।

আমিও তো আপনাদের আপনার লোক হয়ে গিয়েছি।

উঁহু। আপনি বয়সে বড়। প্রণাম করবেন না আপনি। না। সে আবার লিখতে লাগল।

সীতারাম বিস্মিত হ'ল না, কিন্তু মনে হ'ল, এটা ধীরাবাবুর বাড়াবাড়ি, খানিকটা চালবাজির মত। সে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল গাড়ু নিয়ে গামছাটি কাঁধে ফেলে সেই ঝরনার দিকে। যথাসম্ভব দ্রুত সে গেল এবং ফিরল। অনেক কাজ আছে। শুভকাজ, তার জীবনের সাধের কাজ কারম্ভ করবে সে। গ্রামের সমস্ত দেবমন্দির-

গুলিতে প্রণাম করতে হবে। তারপর এখানকার গ্রামদেবতা—জাগ্রত বুড়ীকালী মায়ের স্থানে পূজা করাবে সে। পূজা শেষে নির্মাল্য নিয়ে কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে পাঠশালার দুয়ারের মাথায় টাঙিয়ে দেবে। মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দিয়ে দরজার মাথায় লিখবে—সিদ্ধিদাতা গণেশ জয়তি। তার নীচে পাঠশালা খোলার দিনটি লিখে রাখবে, ২০এ শ্রাবণ, সন ১৩২৬ সাল।

ঝরনা থেকে ফিরে দেখলে, ধীরানন্দ আর লিখছে না, লেখাটা পড়ছে। সীতারাম গাড়ুটি রেখে দিয়ে জামা-গেঞ্জি প'রে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘরে তালা দিলে। এই সকালেই মন্দিরে প্রণাম সেরে আসবে।

ধীরানন্দ বললে, কতদূর বেড়িয়ে এলেন।

ঝরনা পর্যন্ত।

আমিও সকালে বেড়াই রোজ, কিন্তু আজ আর হ'ল না। ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

বেশি সকালে উঠেছেন ব'লে বোধ হয়।

না, কাল রাত্রে ঘুমুই নি একেবারে। সমস্ত রাত্রি ধ'রে একটা কবিতা লিখেছি।

কবিতা!—অবাক হয়ে গেল সীতারাম, এইটুকু ছেলে কবিতা লেখে!

হ্যাঁ। কিন্তু আবার এখন যাবেন কোথায়?

ঠাকুর-দেবতাকে একটু প্রণাম ক'রে আসি। একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে ধীরানন্দ বললে, কিন্তু একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে যে। রঘুনাথ রাজের ছেলে এসেছিল আপনার খোঁজে। কাল রাত্রে কজন লোকে পাঠশালার উঠোনে খুব উপদ্রব করেছে। ওদের বাড়ি তো কাছেই। ওরা দেখেছে, মদ-টদ খেয়েছে। নেচেছে বোধ হয়, ক্ষতিও করেছে কিছু। কয়েকজন বাবুপাড়ার লোকের নাম করলে।

সীতারামের মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল পাঠশালার দিকে।

দাঁড়ান, আমিও যাব।

পাঠশালায় ঢুকে সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠান এবং বারান্দাকে কদর্যভাবে নোংরা ক'রে গিয়েছে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা, মাংসের অবশিষ্ট হাড়ের টুকরো প'ড়ে আছে চারিদিকে। এঁটো মাটির হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়েছে। সাদা ধবধবে দেওয়ালে কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে লিখেছে, চাষা-চাষা-চাষা, শুঁড়ি-শুঁড়ি-শুঁড়ি। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখেছে। বিচিত্র তার ভাষা, বিচিত্র তার ভাব।—

"অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে যদি বা—
দোলায়াং যাতে—
ন চাষা সজ্জনায়তে।"

উঠানটা দুর্গন্ধে ভ'রে উঠেছে। ইতরতম উপায়ে উঠানটাকে ময়লায় পরিপূর্ণ ক'রে গিয়েছে। দর্শক অনেক জ'মে গিয়েছে। নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে তারা কেউ বা মন্দ বলছে এই কুকীর্তির কর্তাদের, কেউ উ এই রসিকতার রসগ্রাহীর মত তাদের তারিফ করছে মৃদুহাস্যের ঙ্গ মৃদুস্বরে। সীতারাম যেন মাটির পুতুলের মত নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। এমন নিষ্ঠুর এবং ইতর অপমানের দুঃখ সে জীবনে করে নাই। এর চেয়ে শিবকিঙ্কর তাকে ধ'রে যদি পথের জার লোকের সামনে অকারণে জুতা খুলে মারত, তা হ'লেও তার ত না। জ্যোতিষ সাহাও এসে উপস্থিত হ'ল, সেও স্তব্ধ প্রথমটা। তারপর সে সজাগ হয়ে উঠল। দৃষ্টি ফিরিয়ে লোকদের দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললে, এই, যা তো, আমার টামনাটা নিয়ে আয় তো। রঘুনাথ, রঘুনাথ আছ?

রঘুনাথ ছিল। সে বললে, আজ্ঞে।

চুন আছে আর?

তা, খানিক—আধেক আছে বোধ হয়।

আছে ভাল, না থাকে দেখে-শুনে নিয়ে এস। দেওয়ালের লেখাগুলো ঘ'ষে মুছে চুন লাগিয়ে দাও। যাও যাও, দেরি ক'রো না। এই যে টামনা এনেছিস? আচ্ছা, চার আনা পয়সা দোব, টামনা ক'রে চেঁচে ময়লাগুলো ফেলে দে দেখি কেউ।

কেউ সাড়া দিলে না। সকলে সরতে আরম্ভ করলে। আজ্ঞে, উ কে করবে!

আট আনা পয়সা দোব।

একজন বললে, গোটা টাকা দিলেও উ মশায় হবে না। মতিয়া মেথরকে ডেকে পাঠান।

হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘ'টে গেল, ধীরানন্দ এগিয়ে এসে টামনাটা তুলে নিলে।

জ্যোতিষ হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, এ কি, এ কি ধীরাবাবু?

ধীরানন্দ মালকোঁচা মেরে জামার আস্তিন গুটিয়ে টামনাটা নি[illegible] একটা স্থানের ময়লার কাছে দাঁড়িয়ে সেটাকে চেঁচে টামনায় তুলে নি[illegible] বিনা বাক্যব্যয়ে।

তারপর বললে, ব্যস্ত হয়ো না জ্যোতিষ। মতিয়াকে এগারো[illegible] আগে পাবে না।

কিন্তু তাই ব'লে আপনি! দেন দেন, আমাকে দেন।

আমার অভ্যেস আছে। মতিয়ার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে [illegible] বাড়ির ড্রেন আমি নিজে এক বছর পরিষ্কার করছি। পাড় মরলে সে বেওয়ারিস পচা জানোয়ার আমিই ফেলি। হাসলে।

সীতারাম এবার এগিয়ে এল, তার নিস্পন্দ অসাড়তাটা এতক্ষণে কাটল বিপরীত একটা ভাবের আঘাতে। সে বললে, না, আমাকে দেন। আমার পাঠশালা।

তার চোখ দুটি থমথম করছিল। ঠোঁট কাঁপছে। ধীরানন্দ বললে, এটা আমি ফেলে দি। এটা নিয়ে টানাটানি ক'রে লাভ নাই। ফেলে দিয়ে টামনাটা সীতারামের হাতে দিয়ে বললে, আপনার পাঠশালা আপনি করবেন বই কি, নিন।

সকল ক্লেদ যেন ধীরানন্দই মুছে দিলে। আবার সমস্ত পরিষ্কার ক'রে স্নান ক'রে যখন সে দেবস্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল, তখন তার মন দিব্য প্রসন্নতায় ভ'রে উঠেছে। সকল দেবস্থানে প্রণাম ক'রে বুড়ীকালীমায়ের পূজা করিয়ে সে এসে পাঠশালায় উঠল। ততক্ষণে পাড়ার মাতব্বররা এসে বারান্দায় জমিয়ে বসেছে সব। জ্যোতিষ সাহা একজন মজুরকে দিয়ে আমের পল্লব খড়-পাকানো দড়িতে গেঁথে বারান্দাটায় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টাঙিয়েছে। আমের পল্লব মুখে দিয়ে দুটি জলপূর্ণ কলসী দিয়েছে দরজার দুপাশে, কলসী দুটির পাশে দুটি ছোট কলাগাছ। উঠানে ছেলেদের ভিড় জমেছে। তারা কলরব করছে। সীতারাম প্রসাদী ফুলমালা নিয়ে উঠানেই দাঁড়াল। ভারি ভাল লাগল। সকালে যতখানি দুঃখে ভ'রে উঠেছিল তার মন, যতখানি ক্ষোভে বিষিয়ে উঠেছিল, তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি সুখে আনন্দে তার মন ভ'রে উঠল। পৃথিবীতে মন্দ মানুষ যত আছে, ভাল মানুষ তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি আছে, পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি। এতে আর সন্দেহ নাই আজ তার। ভগবানের সৃষ্টি যে! ভগবানকে আবার একবার এই মুহূর্তে স্মরণ ক'রে প্রণাম ক'রে সে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

নির্মাল্য বাঁধা, নাম লেখা শেষ ক'রে সে চেয়ারে বসল।

জ্যোতিষ বসল পাশের চেয়ারে। নাও ভর্তি আরম্ভ কর। আমার ছেলের নাম লেখ প্রথম—সীতেশচন্দ্র সাহা। এই সীতেশ, প্রণাম কর্ মাস্টার মশাইকে। দে, ভর্তির ফী দে। হ্যাঁ। আচ্ছা, স্বর্ণকারকাকা, তোমার ছেলে কই গো ?

একে একে ষোলটি ছেলে ভর্তি হ'ল। তার প্রসন্ন মনের কাছে এই ষোল সংখ্যাটিও ভাল লাগল। ষোল, শুভসংখ্যা, পূর্ণতার লক্ষণ।

বিকেলবেলা চারটের সময় ছুটি। ছুটি দিয়ে, সমস্ত গুছিয়ে, দরজায় তালা বন্ধ ক'রে যখন পথে বেরিয়ে এল, তখন সে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। চাবিটা দিতে হবে সাহা মশায়কে, তিনি লোক শোবার ব্যবস্থা করেছেন।

একটা জিনিস ভুল হয়েছে। টিফিনের সময় সেটা মনে হয়েছিল, ছুটির সময়েও আবার মনে হয়েছে। একটা ঘণ্টা চাই। ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে ইস্কুল বসবে। ঢন-ন-ন শব্দে ঘণ্টা বাজলে ছুটি হবে। তার পাঠ্যজীবনের কথা মনে পড়ল, ইস্কুল বসবার ঘণ্টা বাজত, সে যেন ডাক দিত। আবার ছুটির ঘণ্টা। ওঃ, এই শব্দটা কি ভাল লাগে ছেলেদের কানে! ঘণ্টা একটা চাই।

একটা দুঃখ। ধীরাবাবু এমন ব্যবহার করলেন, মা এত আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু শ্যামু-দেবুকে কিছুতেই ভর্তি করলেন না তার পাঠশালায়। নানা রকমের সঙ্গ থেকে বাঁচবার জন্যেই তো বাড়িতে তোমাকে রেখেছি বাবা। তুমিই তো পড়াবে ওদের।

সীতারাম চুপ ক'রে থাকে। মন তার কিছুতেই বুঝতে চায় না যেন।

পাঁচ

সুখী সীতারাম। সুখের জীবনে বর্ষার সতেজ গাছেরই মত সে যেন বাড়তে আরম্ভ করলে। সুস্থ দেহে সবল পদক্ষেপে সে পথে চ'লে যায়, উৎসাহদীপ্ত চোখে ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ায়। প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাদের আদর্শ ছাত্র গ'ড়ে তুলতে। আদর করে, তিরস্কার করে, প্রহার দেয়। বাবার সেবা করে। কিন্তু ওইখানে একটা কাঁটা যেন অহরহ খচখচ করে, নিষ্ঠুররূপে দুঃখদায়ক তার স্পর্শ।

সীতারাম ধীরভাবেই এ দুঃখকে গ্রহণ করলে।

সুখ আর দুঃখ, এই দুই নিয়ে জীবন। আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত্রি এই নিয়ে কাল। পৃথিবীর মাটি, যে মাটিতে ফসল ফলে, যে মাটিতে শুলে মনে হয়, মায়ের কোলে শুয়েছি, সেই মাটিতে পাথর আছে, সে পাথর পায়ে বেধে, নখে হোঁচট লাগে, আছাড় খেলে মানুষ ম'রেও যায়। জল, যে জলে অঙ্গ শীতল হয়, বুকের ভিতরটা জুড়িয়ে যায়, সেই জল মধ্যে মধ্যে বন্যা হয়ে এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এসব কথা সীতারাম জানে। তাই ছোটখাটো বাধাবিঘ্ন এবং দুঃখ সত্ত্বেও সে তার জীবনকে সুখের জীবন ব'লেই মনে করে।

হঠাৎ দুঃখটা একদিন চরম হয়ে দেখা দিল। বাবা রমানাথ মারা গেলেন। আঘাতটা তার পক্ষে ভয়ঙ্কর আঘাত, মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চার বৎসর বয়সে সে মাতৃহীন হয়েছিল, সেই সময় থেকেই বাবা তার মা এবং বাবা দুই-ই হয়েছিলেন।

মরবার সময় বাবা তাকে বললেন, কাঁদিস না যেন। আমি তো সুখের যাওয়া যেছি রে। তুই আমার বংশের মান বাড়িয়েছিস, দশজনা

তোকে পণ্ডিত ব'লে খাতির করছে, ঘরে আমার লক্ষ্মীর মতন বউমা, আমার যেতে খেদটা কিসের? একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন, খেদ একটি থাকল, তোর ছেলে দেখতে পেলাম না। তা—তা আমিই আসব ফিরে তোর ছেলে হয়ে।

সীতারাম পাথরের মূর্তির মত ব'সে ছিল। সে চঞ্চল হ'লে, তার চোখে জল দেখলে বাবা তার হয়তো মহাযাত্রার সময় চঞ্চল হবেন।

সে কাঁদলে না।

লোকে কিন্তু অন্য কথা বললে, জঘন্য নিন্দা করলে তার। বললে, বাবা ম'ল ভাল হ'ল—কথায় বলে না, সীতারামের তাই হয়েছে। বুড়ো অহরহ খিটখিট করত, বুড়ো মরেছে, ও খালাস পেয়েছে।

ইদানীং বাবার ওই একটা কেমন ভাব হয়েছিল। সুখের জন্য যে সংসার তিনিই পেতেছিলেন, সে সংসার যেন তাঁর অসুখের কারণ হয়েছিল। সর্বদা যেন অসন্তোষ লেগেই থাকত। কিছুই পছন্দ হ'ত না। পুত্রবধূ মনোরমার উপর বিরূপতাটা ছিল যেন বেশি, কোন যত্ন করতে গেলেই বলতেন, থাক্ বাছা, থাক্। 'বাছা' বলতেন, 'মা' বলতেন না।

মনোরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অপরাধিনীর মত।

সীতারামকেও তিনি রূঢ়ভাবে অকারণে তিরস্কার করতেন মধ্যে মধ্যে। রবিবার দিন, দিনেও সে এখন বাড়িতে থায়, ভোরে বাবুদের বাড়ি গিয়ে ছেলেদের পড়িয়ে সাড়ে দশটায় বাড়ি ফেরে, সমস্ত দিনটাই বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যায় আবার যায়, রাত্রে ফিরে আসে নিত্যকার মত। একটা রবিবারে বাবা মাঠ থেকে ফিরেছিলেন ক্লান্ত হয়ে, সীতারাম গিয়েছিল বাতাস করতে। পাখাখানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, থাক্ বাবা, থাক্। আমি চাষার ছেলে চাষা, রোদে জলে চাষে খেটেই জীবন গেল, যাবেও। আমরা চেয়ারেতে ব'সে পণ্ডিতি করি না। পাখার হাওয়া খাওয়া আমাদের অভ্যেস নাই।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সীতারাম।

এজন্য সীতারাম একটু দূরে দূরেই থাকত। মনোরমার উপায় ছিল না, এজন্য সে মনোরমাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মনোরমা অদ্ভুত মেয়ে, সে হেসে বলত, তোমারই বাবা, আমার কেউ নয় বুঝি ?

তবু লোকে এই কথা বললে ! বলুক, তার জন্য সীতারামের আক্ষেপ নাই। সে শুধু মধ্যে মধ্যে ভেবে দেখে, বাপের সেবায় কোন ত্রুটি সে করেছে কি না, তার পারলৌকিক কাজ সে যথাসাধ্য করেছে কি না !

মধ্যে মধ্যে গভীর চিন্তা ক'রে সে খতিয়ে হিসেব ক'রে দেখে।

পাঠশালার ছেলেরা তার অন্যমনস্কতার ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে চেয়ে দেখে, একজন অন্যজনকে ইশারা ক'রে দেখায়। বড় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে ফিসফাস শব্দে গবেষণা করে।

কি রকম হয়ে গিয়েছে পণ্ডিত।

হুঁ ভাই।

বাবা মরেছে কিনা।

হুঁ।

বেঁচেছি কিন্তু। আর মারে না। আকু ব'লে ছেলেটা খুকখুক ক'রে হাসতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেরা গবেষণা করে না, তারা একটু অবাক হয়। মাস্টার আর মারে না, কেন ভাই ?

বাবার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে এটা সীতারামের একটা অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, যার ফলে ছেলেদের সে আর মারবে না, অন্তত গুরুতর অপরাধ না হ'লে মারবে না ঠিক করেছে।

বাবার অসুখের প্রথম দিকে। সেই দিন সকালেই সে অসুখের গুরুত্ব বুঝে ডাক্তার ডেকেছিল। ডাক্তারকে দেখিয়ে সে ডাক্তারের সঙ্গেই এল রত্নহাট। তখন সবে সাড়ে দশটা। ছেলেরা সব এসে

পাঠশালায় কলরব করছিল। সে পাঠশালায় ঢুকে তাদের বললে, তোমরা নিজেরা ব'সে পড়। আমি একবার ডাক্তারবাবুর দোকানে যাচ্ছি। ওষুধ নিয়ে শিগগির আসব আমি, বুঝলে?

ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিয়ে কৃষাণটার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে ব'লে ঠিক করেছিল। কিন্তু ডাক্তার বললে, আপনি নিজে নিয়ে যান। ও বলতে গিয়ে গোলমাল ক'রে ফেলবে। প্রথমে পার্গেটিভ, তারপর একটা পাউডার, তারপর মিক্সচার দু দাগ পর পর, বিকেলবেলা আবার একটা পাউডার, এ ও বুঝতেও পারবে না, বুঝাতেও পারবে না।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছেন। নিজেই গেল সে। যাবার সময় পাঠশালায় ব'লে গেল, পড় তোমরা, আমি আসছি। আমার বাবার অসুখ, ওষুধটা দিয়ে আসছি।

একবার ছুটি দিতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু সে তার ভরসা হ'ল না। রত্নহাট বড় কঠিন স্থান। এখানে দশ দিনের সেবার বিনিময়েও একদিনের ত্রুটির মার্জনা নাই। ওদিকে বড় ইস্কুলের পাঠশালার সজাগ দৃষ্টি তার গলদের দিকে। তাই সে ওষুধ দিয়ে ফিরে আসাই স্থির করলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, সওয়া এগারোটা। দু মাইল পথ, যেতে আসতে চার মাইল। একটার মধ্যেই সে ফিরতে পারবে। টিফিনের পর থেকে পড়ানো হবে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেরি হয়ে গেল। খাওয়া হয় নি তার, মনোরমা না-খাইয়ে কিছুতেই ছেড়ে দিলে না। যখন সে ফিরল, তখন দুটো। পাঠশালার বাইরের দরজায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। ভাবছিল, পা ধুয়ে ঢোকাই উচিত। ছেলেরা ভিতরে কলরব করছে, হঠাৎ তার ভেতর থেকে কানে এল—

চল্ রে চল্, আজ আসবে না। বক্তা আকু। আকু বাবুদের পাড়ার একটি বিচিত্র জীব। সীতারাম বলে, অক্রুর মূর্তিমন্ত বিঘ্নরাজ। সীতারাম ওকে আকু বলে না, বলে অক্রূর! অক্রূরের কথা শুনে

সীতারামের হাসি পেল। ওরা বেরিয়ে আসবে এই প্রত্যাশায় সে দরজার বাইরেই দাঁড়াল, এসে থমকে দাঁড়াবে ওরা। কানে এল, জ্যোতিষের ভাইপো সীতেশ বলছে, না ভাই, যদিই আসে।

কক্ষনো না। আমি বলছি। আমি ঠিক জানতে পারি। মাস্টার বাড়ি গিয়েছে, আর তার বাবা ম'রে গিয়েছে। বাস্। এখন আর এক মাস আসবে না। এক মাস অশুচ তো। ভারি মজা, এক মাস এখন কিল-চড় নাই।

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম ক'রে উঠল। রাগে ভিতরটা যেন গর্জে উঠল।

একজন বললে, তারপরে তো আসবে, তখন সুদে আসলে পুষিয়ে দেবে, লাগ্ ধমাধম লাগ্ ধমাধম! বাবা রে! ছেলেটা বোধ হয় শিউরে উঠল।

আকু বললে, দাঁড়া, দাঁড়া, আমি ধ্যান ক'রে দেখি! হ্যাঁ। শোন্, ঠিক তখুনি মাস্টারের বউ ম'রে যাবে। বাস্, আবার এক মাস। তারপরে, হ্যাঁ, ঠিক তখুনি মাস্টারও ম'রে যাবে। বাস্, খালাস।

সীতেশ বললে, না ভাই। আহা, কি দোষ করেছে পণ্ডিত যে, ম'রে যেতে বলছ?

বেজায় মারে ভাই। বাবাঃ! আমাকেই বেশি মারে। এক এক সময় মনে হয়, আমি এইবার ম'রেই যাব।

সীতারাম ভিতরে ঢুকল। পা ধুতে সে ভুলে গেল। চুপ ক'রে গিয়ে চেয়ারে বসল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ভাবলে। হঠাৎ তার চোখে জল এল। ছোট কচি দেহে বড় লাগে, বড় যাতনা হয় ওদের, মনে হয়, ম'রে যাবে। না, ওদের দোষ নাই। দোষ তার। না, আর সে মারবে না তাদের। বাবার মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলে মনে হয় এদেরই শাপে হয়তো—

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

আজও সে বাবার কথাই ভাবছিল।

বাবা নাই। সংসারটা খাঁ-খাঁ করছে। অশান্তি ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবু একটা তার জমজমাট গেল। কথার হুল বাদ দিলে, আবদেরে ছেলে আর বাবার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। অন্যদিকে অসুবিধাও হয়েছে, চাষের ভার এসে পড়েছে তার উপর। সীতারামকে এখন একটু বেশি ভোরে উঠতে হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ ঘুরতে ঘুরতে সে রত্নহাট চ'লে যায়। ভর্তি চাষের সময়, ঝরনার ধারে আর বসে না, বাড়ি আসে, মাঠ দেখে। তা সত্ত্বেও চাষের অবনতি কিছু হয়েছে। তার আর উপায় কি?

মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ির চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বড় বেশি মমতা প'ড়ে গিয়েছে শ্যামু-দেবুর উপর। তা ছাড়া মায়ের স্নেহ, ধীরাবাবুর স্নেহ, সেও তার জীবনের একটা সম্পদ। ধীরাবাবু এখন কলকাতায় পড়ছেন, তিনি তাঁর পড়ার ঘরের বইগুলি দেখবার শুনবার ভার দিয়ে গিয়েছেন। সীতারাম সেই ঘরে যখন ঢোকে, তখন মনে হয়, একটা নতুন রাজ্য। বই পড়ে। বই বাড়ি নিয়ে যায়। বই নিয়ে যেতে ধীরাবাবুর বারণ। বলেছেন, ঘরে ব'সে পড়বেন, কিন্তু বাইরে নিয়ে যাবেন না। বাইরে গেলে বই ফেরে না। অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমি ওটা পছন্দ করি না। সীতারাম কাপড় ঢাকা দিয়ে বই নিয়ে যায়। নিয়ে যায় আবার ফিরিয়ে আনে, রেখে দেয়। হঠাৎ মনে হ'ল, সব বই ফেরত দেওয়া হয় নাই।

এই, এই, কি হচ্ছে সব?

পাঠশালার ছেলেরা অঙ্ক কষছিল, চমকে উঠল। ভাল ছেলেরা শ্লেট নিয়ে আরও সাবধান হয়ে বসল। কেউ দেখছে, টুকছে। যারা দেখছিল, তারা নিজেদের শ্লেটের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ল। দু-একজন ঢুলছিল

তারা জেগে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসল। সীতারাম একটু লজ্জিত হ'ল, অকারণে অন্যমনস্কভাবে সে ধমকটা দিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্য সে গম্ভীরভাবে বললে, অঙ্ক কষ। হ'ল সব? শেষ কর। সে চুপ করলে। পুরানো কথা আবার মনে হ'ল। বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, কয়েকখানা বই বহুদিন তার ঘরে র'য়ে গিয়েছে। বই কখানা ভাল লেগেছিল, তাই আরও দুই-একবার পড়বার ইচ্ছায় রেখে দিয়েছে।

আবার সে সজাগ হয়ে পড়াতে বসল।

বাইরে রাস্তার উপর থেকে কেউ হেঁকে উঠল, হ্যাঁ রে অর্বাচীন, আঁচলে ক'রে মুড়ি খাচ্ছিস ক্যা—ন—, আঁচল যে অঁ—টো—হবে।

সীতারামের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তাকেই কেউ ব্যঙ্গ ক'রে গেল। সে পণ্ডিত শিক্ষক, তাই যথাসাধ্য শুদ্ধ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে তার অজ্ঞাতসারে তার বাল্যজীবনের শেখা তাদের গ্রাম্য চাষী-সমাজের দু-একটা কথা থেকে যায় তার মধ্যে, গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটে তার। একদিন একটি ছেলেকে আঁচলে মুড়ি খেতে দেখে, আঁচলটা উচ্ছিষ্ট হ'ল এই বিষয়ে তাকে সচেতন করতে গিয়ে, এঁটোর পরিবর্তে গ্রাম্য কথা অঁটো বেরিয়ে পড়েছিল। সেই কথা ব'লে রত্নহাটের উচ্চনাসার দল তাকে ব্যঙ্গ করে। প্রথমে 'কেন'র শহুরে উচ্চারণের উপর জোর দিয়ে, পরে গ্রাম্য কথা 'অঁটো'র উপর জোর দিয়ে ব্যঙ্গটাকে প্রকট এবং প্রখর ক'রে তোলে। এর মূলে আছে শিবকিঙ্কর।

তার পাঠশালার ছাত্রই কথাটা প্রথম বলতে আরম্ভ করে। এমন কি এই ব্যঙ্গের সুরটুকু পর্যন্ত সংযোজন করেছে এবং সে ছেলেটি ওই শ্রীমান আকু। তার কাছ থেকে শিবকিঙ্কর হাটে বাজারে ছড়িয়েছে। আজকাল তার পাঠশালায় কিছু বাবুদের ঘরের ছেলে আসছে। ওই মাইনের সমস্যায় বড় ইস্কুলের কড়া নিয়মের পাঠশালায় তাদের পড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখানে ছেলে পড়ানো অনেক সুবিধাজনক মনে

হয়েছে তাদের অভিভাবকদের। এ ছাড়াও ছেলেগুলি অত্যন্ত দুষ্ট-প্রকৃতির, তাই বড় ইস্কুলের পাঠশালার মাস্টারেরা মাইনের জন্য কড়া তাগাদায় আর কঠোর শাসনে তাদের এখানে আসতে বাধ্য করছে। ওরা বলেও এদের, যা না বাবা, রত্নহাটের রত্ন-তৈরির আখড়া সীতেরামের পাঠশালায়। এখানে কেন?

শুধু তাই নয়, তার পাঠশালার ভাল ছাত্রগুলিকে ভাঙিয়ে নেয় ওরা। ছ মাস চেষ্টা ক'রে পাঠশালার সরকারী গ্র্যাণ্ট পেয়েছে মাসিক চার টাকা হিসেবে। কিন্তু সে গ্র্যাণ্ট রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আজও তার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। গতবার কৈবর্তদের একটি ছেলের উপর তার খুব ভরসা ছিল। বৃত্তিও সে পেয়েছে। কিন্তু তার পাঠশালা থেকে তার ছাত্র হিসেবে নয়, ইস্কুলের পাঠশালার মাস্টারেরা তাকে ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই পাঠশালা থেকেই সে বৃত্তি পেয়েছে।

ছেলেদের একজন অঙ্ক শেষ ক'রে শ্লেট এনে নামিয়ে দিলে। সবচেয়ে ভাল ছেলে এইটি। এর উপরই তার এখন ভরসা আছে। আগামী বৎসর ছেলেটি নিশ্চয় বৃত্তি পাবে। একে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না বড় ইস্কুল। ছেলেটি জ্যোতিষ সাহার ভাগ্নে। শ্লেটখানি তুলে নিলে সীতারাম।

বা বা বা! রাইট। রাইট। এটাও রাইট। এটা—এটা কি করলি রে? কোথায় মাথা খেলি আমার, অ্যাঁ? হ্যাঁ, এই যে ফাদার মণি আমার, বাবামণি, এটা কি করেছ মাণিক, অ্যাঁ? পাঁচসাতে কত হয় বাবা, কত হয়?

পঁয়ত্রিশ শ্যায়। মশায়ের ম উড়ে যায় ওদের উচ্চারণের সময়, বলে, 'শ্যায়'।

পঁয়ত্রিশের কত নামবে? পাঁচ, না শূন্য?

পাঁচ। ওই তো পাঁচই লিখেছি শ্যায়।

এটা পাঁচ তো, যোগের সময় কি করেছ? নিজেই যে শূন্য ধ'রে নিয়েছ বাবা। বলি, বার বার বলি, মাণিকচাঁদ পাঁচ লেখাটা ঠিক ক'রে ফেল। তা তুমি করবে না। এই ফল দেখ। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গো-মূত্র। সব বরবাদ। তবে প্রসেস, রাইট। আচ্ছা। যাও, তুমি টিফিনে বাড়ি যাবে তো চ'লে যাও। আর পাঁচ মিনিট আছে।

আর একজন এসে দাঁড়াল। বাবুদের ছেলে, ওই যারা তার কথার বিকৃতি প্রচার করেছে তাদেরই দলের। সীতারাম জানে, ওর কোন অঙ্কটাই ঠিক হয় নাই। তবু এসেছে, শ্লেটখানা দিয়েই সে টিফিনের ছুটিটা পাঁচ মিনিট বাড়িয়ে নেবে। সে বক্রহাসি হাসলে, বললে, কি, শুভঙ্করের সব হয়ে গিয়েছে? বলিহারি, বলিহারি। দাও দেখি। নির্লজ্জ ছেলেটা শ্লেট মুখে দিয়ে তবু হাসছে। সে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলে শ্লেটখানা।

অ্যাঁ! অ্যাঁ! আরে, দেখি, দেখি। শো মি ইওর টিথ। দাঁত দেখি, দেখি। শ্লেট রেখে সীতারাম উঠে দুই হাতে তার ঠোঁট বিস্ফারিত ক'রে দাঁতগুলিকে প্রকট ক'রে ফেললে।

দেখ, তোমরা দেখ। দাঁত মাজে নাই। দেখ তোমরা।

ছেলেটা তবু হাসে। আশ্চর্য নির্লজ্জ ছেলে! ঠোঁট ছেড়ে সে তার কান ধরলে। তবুও সে হাসে। যাও, যাও, দাঁত মেজে এস, যাও।

ছেলেটা মুখে কাপড় দিয়ে বললে, এখনও আজ ভাত খাই নাই স্যার, দাঁত মেজে ভাত খেয়ে আসব একবারে। বাবুদের ছেলেদের লেখাপড়ার ভাগ্যে যাই থাক্ চাল ঠিক আছে। ওরা 'শ্যায়' বলে না, 'স্যার' বলে। মারধোর ক'রেও লাভ নাই, মার খেয়ে ওদের পিঠে প্রায় কড়া পড়েছে। নিত্যানন্দের মত মার খেয়েও ওরা হাসে। সীতারাম বলে, নিপাতনে সিদ্ধ।

ঢং শব্দে একটা বাজল।

ঘড়িটার একটা দোষ হয়েছে এরই মধ্যে, বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরে যাবার তিন মিনিট আগে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করবে। ছেলেরা শ্লেট এনে নামিয়ে দিলে। টিফিনের ছুটিতে ব'সে একে একে শ্লেটগুলি ও দেখবে। ছেলেদের কতক যাবে খেতে, কতক খেলা করবে। ছোট ছেলেগুলো মার্বেল-গুলি খেলতে উঠানময় গর্ত করেছে। রোজই প্রতিদলে একটা ঝগড়া হয়, দল ভেঙে নতুন দল করে, নতুন গাব্বু করবে। তা করুক, রাস্তায় ধুলো মাখার চেয়ে তাই করুক। ওদের জন্যই তো উঠান। উঠান কেন, সবই তো ওদের জন্য।

ঘণ্টা পড়ল টিফিনের। ঘণ্টা একটা কিনেছে। আরও অনেক জিনিস হয়েছে। দুখানা ম্যাপ, একটা গ্লোব, কলকাতায় কেনা একটা ভাল ব্ল্যাকবোর্ড, দুখানা চেয়ার। বাবুদের চেয়ার, সাহার চেয়ার ফেরত দিয়েছে।

অত্যন্ত রাগ হ'ল সীতারামের। দাঁত মেজে খেয়ে আসি।—ব'লে গিয়ে এখনও পর্যন্ত আকু ফিরল না। টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। এই সব ছেলে নিয়ে কারবার করতে হ'লে, মারব না—এ সংকল্প ক'রেও রাখা যায় না। মনে হ'ল, এমন সংকল্প করা ঠিক নয়। মার বন্ধ করাতেই আকুটা আরও পাজী হয়ে উঠেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের একটা গল্প আছে। একটা বাঁদর তার সভাতে রোজ সকালে এসে হাজির হ'ত, রাজাকে একটি মোহর দিয়ে পায়ের কাছে বসত। রাজা তার হাতের ছড়ি দিয়ে তাকে সপসপ ক'রে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেন। বাঁদরটা সুড়সুড় ক'রে চ'লে যেত। একদিন মন্ত্রী সবিনয়ে প্রতিবাদ করলে, এটা মহারাজের ন্যায় কাজ হয় না। বাঁদরটা মোহর উপহার দেয়, আর মহারাজ তাকে প্রহার করেন!

রাজা হেসে বললেন, ভাল। কাল থেকে মারব না।

পরের দিন বাঁদরটা এল, মোহর দিলে, কিন্তু রাজা তাকে নিত্যকার মত প্রহার করলেন না। বাঁদরটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দাঁত দেখিয়ে চ'লে গেল। পরের দিনও প্রহার করলেন না। সেদিন বাঁদরটা রাজার কাপড় ধ'রে টানলে। তার পরের দিন প্রহারের অপেক্ষা ক'রে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিংহাসনের হাতলে উঠে বসল। তারপর দিন উঠে বসল রাজার ঘাড়ে। রাজা সেদিন বাঁদরকে টেনে নামিয়ে, হিসেব ক'রে সব কদিনের পাওনা বেত্রাঘাত তার পিঠে ঝেড়ে দিলেন। বাঁদর আবার সেই পূর্বের মত সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল। আকুকে আজ তার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতারাম হরিসাধনকে ডাকলে, সাধন!

সাধন, ছেলেদের মধ্যে বয়স্ক ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল নয়, কিন্তু তবু ভাল ছেলে, নিষ্ঠা আছে। কোন মন্দ বুদ্ধি নাই। সাধনকে দেখলেই তার নিজের কথা মনে পড়ে। নিজে সে ওই ধরনের ছেলে ছিল। সাধন এসে দাঁড়াল। সীতারাম বললে, তুই যা তো একবার আকুদের বাড়ি। গিয়ে ওকে ডাকবি, বলবি—মাস্টার মশাই ডাকছেন। যদি বাড়িতে না থাকে, তবে ওর মা হোক, বাবা হোক, যার দেখা পাবি, বলবি—আকু টিফিনের আগে এসে আর পাঠশালায় যায় নাই। ও প্রায়ই এই রকম করে। মাইনে দেয় নাই আজ দু মাস। মাইনে নিয়ে কাল পাঠিয়ে দেবেন, না হ'লে আর পাঠশালায় পাঠাবেন না। বুঝলি তো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কি বলবি, কই, বল্ দেখি।

সাধন পাখির মত ব'লে গেল। সীতারাম খুশি হয়ে বললে, ঠিক। যা তো তুই। সাধন পাঠশালার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গেল। সে আসছে শ্যায়।

আসছে? আচ্ছা। নেপলা, ছড়ি কেটে আন।

নেপাল ছড়ি কাটতে ওস্তাদ। নিজে মার খায়, কাঁদে না, পরে মার খেলে খুব খুশি হয়, হাসে। ছড়ি কাটতে তার অদম্য উৎসাহ।

কঞ্চি? না, গাছের ডাল স্যার?

তার আগেই আকু মলিন মুখে নিজেই এসে তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, ধীরানন্দবাবুকে পুলিসে বন্দী করেছে স্যার কলকাতায়। চিঠি এসেছে ওদের বাড়িতে। শ্যামু-দেবু দাঁড়িয়ে আছে।

ধীরাবাবুকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে?

না স্যার। গ্রেপ্তার করে নাই, বন্দী করেছে—রাজবন্দী।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সীতারামের সর্বাঙ্গ। রা-জ-ব-ন্দী!

হ্যাঁ স্যার। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন কিনা!

ঊনিশ শো একুশ সাল। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। সীতারামের সাপ্তাহিক পত্রিকা আসে, তার সারাটা বুক জুড়ে ওই খবর, ওই সব দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের ছবি। ধীরাবাবুর ঘরে সে একখানা বই পেয়েছে, বইখানার নাম—'লাঞ্ছিতের সম্মান'। ঊনিশ শো পাঁচ সালের আন্দোলনে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছিলেন তাঁদের কাহিনী এবং তাঁদের চমৎকার ছবি আছে তার মধ্যে। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' বড় ভাল নাম। লাঞ্ছনা সম্মান হয় তাঁদেরই সাধনায়, কপালের গুণে পঙ্কতিলক চন্দন-তিলকের চেয়েও মহনীয় হয়। ধীরাবাবু উপযুক্ত মানুষ! এবার ধীরাবাবুর ছবি কাগজে উঠবে, ওই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে তাঁর জীবনী, তাঁর ছবি।

বয়স্কের মত, বিজ্ঞের মত, আকু বললে, ধীরাবাবুর মা স্যার, ব'সে আছেন, মুখে একটি কথা নাই, চোখ থেকে শুধু টপটপ ক'রে জল পড়ছে।

সীতারাম উঠে দাঁড়াল। বললে, ছুটি, আজ তোমাদের ছুটি।

নিজেই ঢংঢং ক'রে ঘণ্টা দিল।

পাঠশালা বন্ধ ক'রে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপদে সে বাবুদের বাড়ির দিকে চলল।

মায়ের মূর্তি দেখে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। বুঝতে পারলে না, তিনি সুখে কাঁদছেন কিংবা তাঁর এ দুঃখের কান্না! নিজের মনেও তার যেন এমনই দ্বন্দ্ব চলছে।

অপরাহ্নে ঝরনার ধারে গিয়ে সে উদাস মনে ব'সে রইল। এখানটায় ছোট ছোট বনফুলের ঝোপ আছে, সেখানে তিতির পাখির বাসা। তিতিরেরা সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে ছুটে বেড়ায়, কলরব করে, পোকা ধ'রে খায়, উইটিপিতে হানা দেয়। অল্পদূরে রত্নহাটের এক বাবুদের একটা বাগান আছে, বাগানের চারিধারে তালগাছের সারি। তালগাছের মাথায় সন্ধ্যার সূর্যের রাঙা আলো পড়ে, ঘুঘু ডাকে। এর মধ্যে সে বেশ থাকে, ধ্যানস্থ হয়ে থাকে যেন। আজ সে সব কিছুর দিকেই তার দৃষ্টি পড়ল না। বারেকের জন্যও যাকে বলে, তাও না। কিছু যে ভাবলে, তাও না। শুধু তার চোখের সামনে যেন অহরহ ভেসে বেড়াল ধীরাবাবু।

সন্ধ্যায় শ্যামু-দেবুকে নিয়ে বসল সে।

শ্যামু বিষণ্ণতার মধ্যেও গম্ভীর হয়ে রয়েছে। দেবু তার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তার মুখে যে হাসি দূর দিগন্তে মেঘের কোলে বিদ্যুৎচমকের মত ক্ষণে ক্ষণে নিঃশব্দ-কৌতুকে শুধু দীপ্তিতে খেলে যায়, সে হাসি তার মুখে আজ একবারও ক্ষীণ আভাসে কোন কৌতুকে দেখা দিল না। সে মুখ যেন আজ বর্ষণমুখর শ্রাবণ-রাত্রির মেঘ। অবিরাম বর্ষণ হয়ে চলেছে, বিদ্যুৎ পর্যন্ত নাই। শুধু অন্ধকার।

সে তাদের বললে, জান, দাদা কত বড় কাজ করেছেন?

শ্যামু ঘাড় নেড়ে বললে, জানি।

দেবু, তুমি জান?

দেবু উত্তর দিলে না। সে কাঁদছে।

কেঁদ না। ছি! মাথায় তার হাত বুলিয়ে দিলে সে। আবার

বললে, বড় হয়ে তোমাদেরও দাদার সঙ্গে দেশের কাজ করতে হবে যে। জান তো ?—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয় ।"

বাইরে থেকে নায়েববাবু বললেন, মাস্টার, থাক্। ওদের আর এই সব শিক্ষা দিও না তুমি এখন থেকে।

কানাই রায় সায় দিলে, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, এতেই তোমার ঠেলা সামলানো দায় হবে। পরে বুঝবে।

উপপদ-তৎপুরুষ নামটি মিথ্যা হয় নাই তার। মধ্যপদলোপীকে তবু সে সহ্য করতে পারে।

হঠাৎ সীতারাম চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় অন্যায় হচ্ছে, ধীরাবাবুর বইখানি আজও ফেরত দেওয়া হ'ল না।

ছয়

সীতারামের জাঠতুত ভাই পণ্ডিতদাদা দোষে-গুণে মানুষটি ভাল। শান্ত. নিরীহ মানুষ, গ্রামে পাঠশালা করে, গ্রামের দলিল-পত্র লেখে, এ ছাড়া জপতপ করে। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পাবে, সম্পত্তিবান চাষী গৃহস্থ শ্বশুর, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান। পণ্ডিতদাদার স্ত্রী-পুত্র অধিকাংশ সময় সেখানেই থাকে। এখানে পণ্ডিতদাদা পাঠশালাটি নিয়েই আছে গ্রামের বাদ-বিসম্বাদ যেখানেই হোক, মীমাংসা করবার জন্য

নিজেই গিয়ে দু পক্ষকে অনুরোধ করে। জমিদারের খাজনা আদায়ের সময় গোমস্তার আসরেও নিজে থেকেই যায়, লোকের বাকি-বকেয়ার হিসাব দেখে দেয়, লোকজনকে খাজনা বাকির জন্য তিরস্কার করে, সুদ মাপের জন্য গোমস্তাকেও অনুরোধ করে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় পণ্ডিতদাদা এসে সীতারামকে তিনবার খুঁজে গেল। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হতেই স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে পণ্ডিতদাদা বললে, চল্, তোর বাড়িতেই চল্।

বাড়িতে এসে দাদা বললে, ওপরে চল্।

ওপরে? কেন গো? কি এমন, ব্যাপার কি বল দেখি? সীতারামও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

চল্, বলছি। নীচে আবার কৃষাণ-বউটা আছে।

উপরে গিয়ে বসল দুজনে। মনোরমা সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বুকের ভিতরটা তার ঢিপঢিপ করছে।

পণ্ডিতদাদা বললে, ধীরাবাবুর জেলের খবর যেদিন আসে, সেদিন তুই পাঠশালার ছুটি দিয়েছিলি?

সীতারাম চমকে উঠল, কথাটা এ ভাবে সে কোনদিন ভেবে দেখে নাই। সে বললে, হ্যাঁ। খবরটা শুনলাম, শুনলাম, চিঠি এসেছে বাবুদের বাড়িতে, মা কাঁদছেন, শ্যামু দেবু কাঁদছে। ওঁদের বাড়িতে পড়াই, ওঁরা জমিদার, সে সম্বন্ধও একটা আছে। আমি থাকতে পারলাম না, ছুটে গেলাম। যাবার সময় ছুটি দিয়ে গেলাম।

পণ্ডিতদাদা বললে, ছুটিটা না দিলেই পারতিস। তুই না থাকলে ছেলেরা সব আপনিই পালাত।

সেও তো সেই একই কথা। সীতারাম হাসলে।

না। এক কথা নয়। ওখানকার লোকে সাব-ইন্সপেক্টারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে ?

হ্যাঁ। আমি আজ গিয়েছিলাম একটা কৈফিয়ত ছিল দাখিল করতে। তা উনি আমাকে বললেন। রত্নহাটের একদল লোক দরখাস্ত করেছে। পাঠশালায় অসহযোগ প্রচার করিস তুই। ধীরাবাবুর জেলের খবর এলে পাঠশালা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করেছিল তাঁকে সম্মান দেখাতে, বাড়িতে চরকা কাটে। চরকা কাটিস নাকি ?

কাটি। সীতারাম নিজেকে এতক্ষণে সংযত ক'রে নিয়েছিল।

তাই তো। পণ্ডিতদাদার মাথায় মাথাজোড়া টাক, টাকে হাত বুলানো তার একটা মুদ্রাদোষ। বিশেষ ক'রে সমস্যাসঙ্কুল সময়ে পণ্ডিত-দাদা মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

সীতারাম বললে, করলে ওই শিবকিঙ্করেরা করেছে। তা করুক। আবার একটু পরে বললে, অন্যায় তো কিছু করি নাই। যা হয় হবে।

শিবকিঙ্কর বা তার দলটিই শুধু নয়। আশ্চর্য হয়ে গেল সীতারাম, প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকেই যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দরখাস্তে অনেকেরই প্রেরণা আছে, তার প্রমাণ সে পরের দিন সকালেই পেলে।

রত্নহাট ঢুকতেই মণিলালবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। মণিলালবাবু গোঁফে তা দিচ্ছিলেন অভ্যাসমত। একটু হেঁট হয়ে ছোট একটি নমস্কার ক'রে সীতারাম চ'লে আসছিল। মণিবাবু বললেন, হ্যাঁ হে, তুমি নাকি তোমাদের জমিদারবাবুর জেল যাওয়ার অনারে পাঠশালা বন্ধ দিয়েছ শুনলাম ?

সীতারাম একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেকে বেশ শক্ত ক'রে নিলে, মাথার ভিতরে প্রথমেই যেন দপ ক'রে আগুনের শিখার মত রাগ হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সবিনয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আজ্ঞে, তা দিয়েছি। তবে আমাদের জমিদারবাবু ব'লে নয়, যিনিই এমন গৌরবের

কাজ করবেন, তাঁর জন্যেই দোব। আপনার ছেলেও তো আমাদের ধীরাবাবুর বয়সী, তিনি গেলে তাঁর অনারেও দোব।

মণিবাবু এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। সীতারাম কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে চ'লে এল মণিবাবুকে অতিক্রম ক'রে।

রত্নহাটের এই সব বাবুদের দেখে আর তার মনে পূর্বেকার মত সে বিস্ময় জাগে না, সে বিস্ময় আর ভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সে ভেবে দেখেছে, ভক্তি আর ভয়ে মিশে এমনটা হয়। জমিদার, বাবুলোক, দালানবাড়ি ধন ঐশ্বর্য এই ধারণাটা চাষী প্রজার ছেলে সে, তাকে ভক্তিমান ক'রে তুলত। পাঠশালায় সে দেখেছে, অবস্থা-ভাল ঘরের ছেলেরা যারা ভাল জামা কাপড় প'রে আসে, নতুন রকমের পেনসিল, ঝকঝকে নতুন বই রঙ-চঙে মার্বেল যাদের থাকে, লাল নীল লেবেঞ্চুস পকেটে নিয়ে যারা পাঠশালায় আসে, তাদের প্রীতিভাজন হবার জন্য এমন কি তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্যও অন্য ছেলেরা লালায়িত হয়ে ওঠে। নেহাৎ গরিব যারা, তারা কাছে এসেও একটু তফাত বজায় রেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে। ঐশ্বর্যবান ছেলেটির কোন জিনিসটি প'ড়ে গেলে তারা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে সেটি তুলে তার হাতে দিলে কৃতার্থ হয়ে যায়। বাবুদের প্রতি ভক্তিও ঠিক এই জিনিস, এতটুকু প্রভেদ নাই।

আর ভয়? কিসের ভয়? ভয়ও আর তার হয় না। একটা জিনিস সে বুঝেছে। এরা হুঙ্কার ক'রে উঠবেই, ওটা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হুঙ্কারের পিছনে আছে দু-চারটে চাপরাসী। সাহস ক'রে হুঙ্কারকে অগ্রাহ্য ক'রে দাঁড়াতে পারলে ওরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর ভয়ই বা করবে কেন? ওরাও মানুষ, আর সবাইও মানুষ।

আবার পিছন থেকে ডাকলেন মণিবাবু, শোন, শোন, ওহে ছোকরা!

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর চাপরাসী সাদৎ শেখ ছুটতে ছুটতে এসে তার সামনে এসে দাঁড়াল, তুমাকে ডাকছেন বাবু।

সীতারাম স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার এখন সময় নাই। বাবুকে বল গা।

সময় নাই! বিস্মিত হয়ে গেল সাদৎ।

না। সেই স্থির দৃষ্টিতেই সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সাদৎ বললে, চল ভাই একবার। কেন আমাকে হাঙ্গামা-হুজ্জত করাবে?

হাতের লণ্ঠন ছাতা লাঠি কাঁধের জামা এ সবগুলিই পথের উপরেই রাখলে সীতারাম। সাদৎ বললে, হাতে ক'রে নিয়েই চল পণ্ডিত। উগুলান আর কি ভারী হবে?

সীতারাম উত্তরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, হাতাহাতি হাঙ্গামা করবে? না লাঠি নেবে? বল, তা হ'লে লাঠিখানা তুলে নিই।

চাষীর ছেলে, বাল্যকাল থেকেই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাদের মানুষ হতে হয়, তার উপর জন্ম থেকেই তার দেহের গঠন বলিষ্ঠ। কিন্তু এমনভাবে জীবনে সে কোনদিন দাঁড়ায় নাই। কালে-কস্মিনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু তাতে এতে অনেক প্রভেদ। আজ তার মনে হ'ল, খুন হতেও সে রাজি আছে। এ উদ্ধত অপমান সে সহ্য করবে না।

বলিষ্ঠ দেহে তার এইভাবে দাঁড়ানো বেমানান হয় নাই, সাদৎ সচকিত হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'লে হয়তো হাঙ্গামা সঙ্গে সঙ্গে বেধে যেত। সাদৎও বলশালী ব্যক্তি, কিন্তু সাদতের দিক থেকে এটা মনিবের কাজ, হুকুমমত করতে হবে, বিশেষ ক'রে মনিব ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন। সে হেঁকে বললে, পণ্ডিত বলছে, সময় নাই তার এখুন।

মণিবাবুর কাছারি অল্প দূরেই, তিনি নিজের চোখেই সব দেখছিলেন, তিনি বললেন, থাক্। তুমি চ'লে এস।

সাদৎ বললে, তুমার সঙ্গে মারামারি করতে আমি আসি নাই পণ্ডিত-ভাই। রাগ করিও না তুমি আমার উপর। কি করব বল? গরিবগুনা মুরুখ্য লোক, এই ক'রেই খেটে খাই। সে চ'লে গেল।

সীতারাম একটু লজ্জিত হ'ল। সত্যই সাদতের উপরে এতটা রাগ করা তার উচিত হয় নাই। সাদতের দোষ কি? কিন্তু এই মণিলাল-বাবু? এরা কি? ছাতা লাঠি লণ্ঠন জামা তুলে নিয়ে সে বাবুদের বাড়িতে ঢুকল।

পাঠশালার দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল জ্যোতিষ সাহা। সাহা বললে, পণ্ডিত, সেদিনের কাজটা ভাই ভাল হয় নাই।

সাহার বক্তব্যের মর্ম মুহূর্তেই সীতারাম বুঝতে পারলে। তবু সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ধীরাবাবুর জেলের খবর শুনে পাঠশালার ছুটি দেওয়াটা ভাল হয় নাই।

সীতারাম মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ভাবতে লাগল।

ইস্কুল-সাব-ইনেসপেক্টারবাবু একবার ডেকেছেন তোমাকে। তুমি যাও একবার।

সীতারাম বললে, যদি ইস্কুলের এড বন্ধ ক'রে দেয় সাহা মশায়, তা হ'লে আপনারা—আপনারাও কি পাঠশালা—

বাধা দিয়ে সাহা বললে, আগে থেকে এতটা ভাবছ কেনে পণ্ডিত? একটা কৈফিয়ত দিলেই চুকে যাবে। সে আমাকে সাব-ইনেসপেক্টারবাবু বলেছেন। তা ছাড়া রজনীবাবু ইনেসপেক্টার লোক ভাল, ধার্মিক মানুষ, মহাশয় লোক। যাও, তুমি একবার ঘুরেই এস।

ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টর রজনীবাবু সত্যই ভাল লোক। একটু

বেশি মাত্রায় ভাল লোক। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, কোন ক্রমেই মিথ্যা কথা বলেন না, কোন পণ্ডিতের কাছে এক টুকরো জিনিস গ্রহণ করেন না। শুধু দুটি বাতিক আছে। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, অসুখ-বিসুখ হ'লে তাঁর ওষুধ খেলে তিনি খুশি হন, এবং রামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং বিবেকানন্দদেবের আবির্ভাব-তিরোধান-উৎসব করলে রজনীবাবু তাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না ক'রে পারেন না।

সীতারামের দুর্ভাগ্য, সীতারামের শরীর খুব ভাল, সে কখনও রজনীবাবুর ওষুধ খায় নাই। এবং এই রত্নহাট গ্রামখানি রত্নহাটই বটে, এখানে মণিলাল ও শিবকিঙ্করের মত রত্নের দল এত প্রবল যে, রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব এখানে হওয়া আজও পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। একবার হয়েছিল আয়োজন, ধীরানন্দের সমবয়সী এবং তারই কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিবকিঙ্করের দল পণ্ড ক'রে দিয়েছিল। তারা পরামর্শ করেছিল, উৎসব হ'লে, একটা পাঁঠা নিয়ে গিয়ে তারা সেই উৎসবক্ষেত্রে বলিদান দিয়ে দেবে।

চিন্তিত হয়েই সে সবিনয়ে নমস্কার ক'রে গিয়ে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, একটু ব'স। বসতে হবে। এদের কাজ সেরে দিই।

ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টরের দরবার। এই সার্কেলের পাঠশালার পণ্ডিতদের দুজন চারজন প্রতিদিনই আসে। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ, চোখে মুখে শীর্ণতা, বিনীত দৃষ্টি। সাব-ইন্সপেক্টরের দাওয়ায় ব'সে থাকে খাতাপত্র নিয়ে। রত্নহাটের বাবুরা চ'লে যান সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ঝলমলে পোশাক প'রে। তারা বাক্যহীন হয়ে চেয়ে দেখে। ক্বচিৎ এক-আধ জন সেকেলে বুড়ো পণ্ডিত এখানকার বাবুদের কোন ছেলেকে পেলে যেচে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করে। তারপর অকস্মাৎ কঠিন বানান, জটিল মানসাঙ্ক ধরতে শুরু করে। বাবুদের ছেলেরা নিরুত্তর হ'লে খুশি হয়। মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা দেয়। আবার দু-এক

জন ছেলে এমনও আছে, যারা এখানকার ভাবী শিবকিঙ্কর। তারা প্রথমেই ধমক মেরে দেয়, সাট-আপ। পড়া ধরবার তুমি কে?

একের পর একজনকে ডাকেন রজনীবাবু, মহেশপুর পাঠশালার পণ্ডিত মশাই!

আজ্ঞে, যাই বাবু! বৃদ্ধ পণ্ডিত হাতজোড় ক'রে গিয়ে দাঁড়ায়। মাসিক চার টাকা সাহায্য পায় পণ্ডিত। মহামহিম মহিমার্ণব রত্নহাট সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টর মহোদয় সমীপে অধীনের একান্ত বিনীত প্রার্থনা, এই চারি টাকা পরিমাণ সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা করিতে আজ্ঞা হয়। বৃদ্ধ পণ্ডিত বলে, বাবু মশায়, আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পাঠশালা করছি, প্রথম ছিল দু টাকা সাহায্য। কিন্তু আজও পাঁচ টাকা হ'ল না। হুজুর বিবেচক, অধীন কি বলবে? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখুন।

রজনীবাবু বললেন, আপনার তো আরও বাড়তি উপায় রয়েছে পণ্ডিতমশায়। গোমস্তার কাগজ সেরে দেন, দোকানের খাতা লেখেন। একটা টাকা এড বাড়লে আর কি এমন বেশি পাবেন?

পণ্ডিত হাত জোড় ক'রে বললে, হুজুর গোমস্তার খাতা লিখে আমি কিছু পাই না। যে কদিন খাতা লিখি, সেই কদিন দু মুঠো অন্ন মেলে শুধু। তবে দোকানের খাতা লিখে দি, দোকানী দু টাকা ক'রে দেয় মাসে। একটু চুপ ক'রে থেকে পণ্ডিত আবার বললে, হুজুর অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন, এক টাকা এমন কি বেশি? কথা সত্য। কিন্তু হুজুর, আমার বড় সাধ, একান্ত বাসনা, আমার এড পাঁচ টাকা হয়। আশ-পাশের পাঠশালা পাঁচ টাকা পায়, আমি চার টাকা পাই, আমার লজ্জা হয়। এইটি আমার শেষ সাধ, আমার—

পণ্ডিতের বাক্যস্রোতে রজনীবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমি উপরে পাঠিয়ে দিলাম দরখাস্ত। কোতলঘোষার পণ্ডিত মশায়!

কোতলঘোষা ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তাঁরা আবার তান্ত্রিক। সেখানকার পণ্ডিত এসে দাঁড়াল। পণ্ডিতটি জাতিতে কায়স্থ, ধর্মমতে বৈষ্ণব। দুর্বুদ্ধিবশত পণ্ডিত একটি দুবিনীত ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত শাক্ত তান্ত্রিকদের পাঁঠাবলি এবং কারণ করা নিয়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেছে, বলেছে, কেন বাবা আমাকে আর কষ্ট দাও, নিজেই বা কষ্ট পাও কেন? এমন কুলকর্ম রয়েছে, অনুস্বার বিসর্গ লাগালেই মন্ত্রং হয়ে যাবেং, আর তার সঙ্গে দু ঢোক কারণ। বাস্, তোমার অন্ন খায় কে? এ কষ্ট কেন তোমার? সেই হেতু তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হয়েছে।

রজনীবাবু হেসে বললেন, কাজ কি এ রকম কথা ব'লে?

আজ্ঞে না, আর কখনই বলব না হুজুর। তারপর সে বললে, আজ্ঞে বাবু, রামকৃষ্ণ-কথামৃতের কত দাম? আমি একখানা আনাতে চাই। দোকানের ঠিকানাটাও যদি লিখে দেন। কায়স্থের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চিন্তার মধ্যেও সীতারাম তারিফ করলে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রসঙ্গ ঝাঁ ক'রে কায়দা মাফিক এনে ফেলেছে কায়স্থ পণ্ডিত!

এর পর পালা এল পলাশবুনীর বৃদ্ধ পণ্ডিতের। এই পণ্ডিত মশায়টির সঙ্গেই এতক্ষণ সীতারাম কথা বলছিল। পণ্ডিত নিজের দুঃখের কথাই বলছিলেন। অনেক দুঃখ করেছেন জীবনে। যে গ্রামে পাঠশালা করেছেন, সেখানে পাঠশালা করবার অনুমতি লাভের জন্য জমিদারের কাছারির পাচকবৃত্তি স্বীকার করতে হয়েছিল। সেকালে জমিদার মহলে এলে তাঁকে রান্না করতে হ'ত। জমিদারের গ্রামদেবতার পূজা করতে হ'ত। এটায় অবশ্য লাভ ছিল। এর ফলে গ্রাম্য পৌরোহিত্য পেয়েছিলেন। আখমাড়াইয়ের সময় শালপূজো ক'রে গুড় পেতেন, ইতুপূজো ক'রে কলাই পেতেন। কিন্তু পণ্ডিত হেসে বললেন, বাবা, সকাল থেকে দেড় প্রহর বেলা পর্যন্ত পাঠশালা, তারপর স্নান, তারপর

পূজো। বাবা, দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বে কখনও মুখে জল দিতে পেলাম না জীবনে। তার ফলে ব্যাধি জুটেছে, এখন তার উপর এই কন্যাদায়। জীবন শেষ হয়ে গেল। আর হয়তো দু-এক বছর। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোমাদের আমল তো সোনার আমল বাবা। গেরস্তের বাড়িতে ছেলের জন্যে ধরনা দিতে হ'ত। ছেলের বাবা বলত, আমাদের ছেলের নেকাপড়া ক'রে কি হবে? ছেলের মা-পিসী বলত, বংশে নাই, নেকাপড়া আবার সহ্য হবে তো? থ্যানত হবে না কি হবে, কাজ নাই। তুমি তো বাবা কৈবর্তদের ছেলে নিয়ে পাঠশালা করছ এখন। এখন সব লেখাপড়া শিখবার একটা চাড় হয়েছে। আরও হবে। আমরা দেখব না, তোমরা দেখবে।

সীতারাম স্বীকার করলে সে কথা। বললে, তা বটে। রজনীবাবু ডাকলেন, পলাশবুনির পণ্ডিতমশায়!

ব্রাহ্মণ পৈতেটি হাতে জড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন, হুজুর, গরিব ব্রাহ্মণ, এইটুকুই আমার অন্ন। এটুকু আমার মারা গেলে ছেলেপিলে নিয়ে মারা যাব। তার উপর কন্যাদায়।

বৃদ্ধ পণ্ডিত কন্যার পাত্র সন্ধান করতে গিয়ে প্রায় দশ-বারো দিন পাঠশালা কামাই করেছেন।

সকলকে বিদায় ক'রে রজনীবাবু ডাকলেন, সীতারাম!

সীতারাম নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, ব'স। বড় খামের ভিতর থেকে একখানি দরখাস্ত বার ক'রে তিনি নিজে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমাদের গ্রামের পণ্ডিত, সে তো তোমার দাদা। তাকে সব বলেছি, শুনেছ তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি তো ইংরেজীও কিছু জান। প'ড়ে দেখ, মোটামুটি বুঝতে পারবে। সীতারামের হাতে দিলেন দরখাস্তখানি।

টাইপ করা দরখাস্ত—To the District Magistrate. একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে। সাহেব পাঠিয়েছেন ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টরের কাছে, তদন্তের জন্য।

দরখাস্তের উপলক্ষ্য, ওই ধীরানন্দ মুখুজ্জের অসহযোগ আন্দোলনে জেল হবার সংবাদ এলে সন্দীপন পাঠশালার শিক্ষক সীতারাম পাল পাঠশালা বন্ধ দিয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হবে, তার ধীরানন্দের প্রতি অনুরাগ। সীতারাম ধীরানন্দের প্রজা, তাদের বাড়িতেই সে থাকে, তারই আদর্শে সে অনুপ্রাণিত। এই মতিভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবা ধীরানন্দ বর্তমানে অহিংসা আন্দোলনে যোগ দিলেও আসলে সে সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সীতারাম ধীরানন্দের পরামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদেব রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সীতারাম অত্যন্ত দুর্বল মানুষের মত ধীরে ধীরে দরখাস্তখানি রজনীবাবুর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। একটা দুরন্ত ভয়ে তার মন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ধীরানন্দ সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত! সীতারাম তার পরামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদের রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে! তার মনে হ'ল, পাঠশালার এড বন্ধ হওয়া, এ তো সামান্য কথা, এতে তো তাকে পুলিস ধ'রে নিয়ে যেতে পারে!

রজনীবাবু প্রশ্ন করলেন, পাঠশালা তুমি বন্ধ কেন দিলে? এ আমি কি লিখব?

নিজেকে সংযত ক'রে কোনক্রমে সীতারাম বললে, আমি তো ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দিই নাই। আমি ওঁদের বাড়িতে থাকি, ওঁরা আমাকে বাড়ির ছেলের মত দেখেন, ওঁদের এই বিপদের কথা শুনলাম, শুনলাম, মা কাঁদছেন, আমার ছাত্র দুটি কাঁদছে, আমি—

রজনীবাবু বললেন, তুমি কি এমন কোন কথা বলেছিলে যে,

আজ ধীরানন্দবাবু দেশের জন্য জেলে গিয়েছেন, সেই জন্য পাঠশালা বন্ধ হ'ল ?

আজ্ঞে না বাবু। যে দিব্যি করতে বলেন, আমি সেই দিব্যি করতে পারি। আপনি ছেলেদিগের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জ্যোতিষ সাহা মশায় আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রজনীবাবু বললেন, সাহা মশায়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি অবিশ্যি তুমি যা বলছ, তাই বলেছেন। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, তাই আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটু সাবধান হবে এর পর থেকে। বরং—

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললেন, তুমি যদি ধীরানন্দবাবুদের বাড়িতে থাকা ছেড়ে দাও, তবে ভাল হয়। বুঝলে ?

সীতারাম চুপ ক'রে রইল। দেবু-শ্যামুকে পড়ানো ছেড়ে দেবে ? ওদের বাড়ির সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দেবে ? এই বিপদের সময় ?

রজনীবাবু বললেন, তা ছাড়া এসব আন্দোলন, এই রাজনীতি, এ আমাদের দেশের নয়। এ হ'ল বিদেশী জিনিস। এতে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে না। আমাদের একমাত্র পথ হ'ল ধর্মের পথ, ধর্মনীতির মধ্যে দিয়েই আমাদের মুক্তি আসবে। পরমহংসদেব, স্বামীজি এ কথা বার বার ক'রে ব'লে গিয়েছেন।

সীতারাম তাকিয়ে দেখলে, রজনীবাবুর দেওয়াল-আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো রয়েছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত থেকে স্বামীজির বইগুলি—'বীরবাণী', 'পরিব্রাজক' কত বই !

রজনীবাবু ব'লেই যাচ্ছিলেন বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা। তিনি ব'লে গিয়েছেন, আমি ভারতবাসী। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতবাসী আমার ভাই। চণ্ডাল ভারতবাসী।

বাইরে থেকে কেউ ডাকলে, রজনীবাবু রয়েছেন নাকি ?

কে ? মাস্টার মশাই ?

হ্যাঁ। আজকের জোর খবর। সি. আর. দাশ অ্যারেস্টেড হয়েছেন।

তাই নাকি ? বেরিয়ে গেলেন রজনীবাবু।

করলে কি মশাই ? কাঁপিয়ে দিলে যে !

হ্যাঁ।

ছেলেরা তো কেউ আজ ক্লাসে আসবে না।

হেসে রজনীবাবু বললেন, আপনারা বেঞ্চি আগলে ব'সে থাকুন। নইলে এ গ্রামকে বিশ্বাস নাই। দেবে হয়তো দরখাস্ত ক'রে। বেচারী সীতারামের বিরুদ্ধে দরখাস্তের কথা জানেন তো ? অথচ বেচারী ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দেয় নাই। ধীরানন্দদের বাড়িতে থাকে, এমন একটা বিপদের খবর এল, বেচারা ছুটে গিয়েছিল, বিপদে যেমন মানুষ মানুষের বাড়ি যায়।

সীতারাম ঘরের মধ্যেই ব'সে ছিল। একটু পরে বেরিয়ে এল। রজনীবাবু বললেন, যাও, তুমি বাড়ি যাও। ভেব না, আমি ঠিক ক'রে দেব সব।

সাত

রজনীবাবুকে দোষ দিতে পারবে না সীতারাম। রজনীবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। রিপোর্টে তিনি কি লিখেছিলেন সে না দেখলেও সীতারাম জানে, তিনি তাকে বাঁচিয়েই রিপোর্ট দিয়েছেন। দোষ বোধ হয় সীতারামের ভাগ্যের। তা ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পায় না সে।

হঠাৎ সেদিন মোটরকার এসে দাঁড়াল পাঠশালার দরজায়। মোটর থেকে নামলেন পুলিস সাহেব। আকু ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আবার তখনই ফিরে এল। পুলিস সায়েব, মাস্‌শাই।

পুলিস সায়েব?

হ্যাঁ। দফাদারকে শুধালাম, দফাদার বললে।

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল সীতারাম। পুলিস সাহেব দরজার মাথায় কাঠের উপরের লেখা নামটা পড়ছিলেন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন, পিক্যুলিয়ার নেম! দারোগার দিকে ফিরে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইস দিস সন্দীপন? হু ইজ হি?

দারোগা বললেন, ঠিক জানি না সার্।

সীতারাম নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা দুরন্ত ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। গ্রাম্য পাঠশালায় বড় একটা সাহেব-সুবারা আসেন না, এলেও আসেন এস. ডি. ও., নয়তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। পুলিস সাহেবের পাঠশালায় আসা আর কাঠুরের কাছে যমের কাঠের বোঝা তুলে দিতে আসায় কোন প্রভেদ নাই। গল্পের কাঠুরে যমকে ডেকেছিল, ফিরে যেতে বললে, সে ফিরে গিয়েছিল। এ কিন্তু যখন না ডাকতে নিজে থেকে এসেছে, তখন সে কি শুধু শুধু ফিরে যাবে?

গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে সীতারাম নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। দারোগা বললেন, এই পাঠশালার পণ্ডিত সার্।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সাহেব বললেন, তুমি পণ্ডিত? সীতারাম পাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

সাহেব বললেন, সন্দীপন পাঠশালা! মানে কি?

কথাটা বুঝতে পারলে না সীতারাম, বিব্রত অপ্রতিভের মত বললে, আজ্ঞে?

সন্দীপন নাম কেন পাঠশালার? সন্দীপন কে?

একটু বিস্মিত হ'ল সীতারাম। বাঙালী সাহেব, হিন্দুর ছেলে, শুনেছে, সাহেব খুব বড় বংশের ছেলে, সন্দীপন কে তা সাহেব জানেন না! সে হাত জোড় ক'রে বললে, হুজুর, শ্রীকৃষ্ণের গুরুর নাম সন্দীপন মুনি। সন্দীপন মুনির পাঠশালাতেই কৃষ্ণ বলরাম লেখাপড়া শিখেছিলেন।

আই সী। স্থির দৃষ্টিতে সাহেব কিছুক্ষণ সীতারামের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার উপাধি তো পাল! চাষী সদ্‌গোপের ছেলে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তোমার গ্রামও তো ছোট চাষীর গ্রাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। এই পাশেই, ক্রোশখানেক।

ইয়েস, ইয়েস। আই নো, আই নো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, সন্দীপন কেন নাম দিলে পাঠশালার? অ্যাঁ? পরিত্রাণায় সাধুনাং? হাসলেন তিনি একটু। তারপর আবার বললেন, তোমার মাথা থেকে এসেছে? অ্যাঁ?

সীতারাম বুঝতে পারলে না, এই নামকরণের মধ্যে কোথায় অপরাধ লুকিয়ে আছে। তবে সে ভীত না হয়ে পারলে না। সাহেবের কথাগুলি ধমক নয় কিন্তু রূঢ়, তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর। হাতুড়ির মত আঘাত করে না, ধারালো ছুরি দিয়ে অবলীলাক্রমে সহজ ছন্দে কেটে চলে। সীতারামের মনে হ'ল, সাহেব ঠিক পেন্সিল কাটার মত তাকে যেন কেটে চলেছেন।

সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, কে পাঠশালার নামকরণ করেছে?

সীতারাম বললে, আজ্ঞে, ধীরানন্দবাবু।

আই সী। চল, তোমার পাঠশালা দেখব।

এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয়, তা পাঠশালার ছেলেরা জানে। তারা

ইতিমধ্যেই আপন আপন জায়গায় ব'সে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল, এমন কি আকু পর্যন্ত। সাহেব ভিতরে ঢুকতেই তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, নমস্কার করলে। সীতারাম চেয়ারখানি ছেড়ে দিলে। টেবিলের উপর খাতাপত্রগুলি নামিয়ে দিলে। সাহেব সেগুলি বাঁ হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তিনি ঘরখানির আসবাব, সরঞ্জাম এইসব দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ছেলেরা কয়েকজন এগিয়ে এসে নমস্কার ক'রে আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে
দরশক এসেছেন অদ্য বিদ্যালয়ে।
প্রণাম তোমার পদে ওহে মতিমান,
আশীর্বাদ কর যেন হই জ্ঞানবান।"

সাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা, হয়েছে। গুড।

সীতারাম ছেলেদের ইঙ্গিত করলে, তারা থেমে গেল।

সাহেব হঠাৎ উঠলেন, চারিদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে দেখে এলেন কিছু। তিনি দেখে এলেন দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে ছেলেদের লেখাগুলি—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, ভোলা চোর, আকু ডাকাত, বন্দে মাতরম্, গান্ধী মহারাজের জয়, বন্দে মাতরম্।

সাহেব ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম জান?

সীতারাম জ্যোতিষ সাহার ভাইপোর দিকে চেয়ে বললে, বল, ভয় কি?

সে জোড়হাত ক'রে বললে, ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

সাহেব বললেন, মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ। গুড।

আচ্ছা, তোমরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়লোকের নাম জান? টাকায় বড়লোক নয়—ভাল লোক, বড়লোক?

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো, বিহ্বল দৃষ্টিতে মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকজন উপরের দিকে মুখ ক'রে ভাবতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আকু মৃদু হাসছিল তার অভ্যাসমত। সাহেবের চোখে চোখ পড়তেই সে হেসে মুখ নামিয়ে বললে, মহারাজ গান্ধী।

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, চিত্তরঞ্জন দাশ।

একজন বললে, মতিলাল নেহরু।

আকু আবার ব'লে উঠল, সুভাষচন্দ্র বসু। জহরলাল নেহরু।

সীতারামের হাত-পা সত্য সত্যই হিম হয়ে গেল। সে ঘামছিল।

সাহেব বললেন, হয়েছে। যাও, তোমাদের ছুটি। যাও।

ছেলেরা চ'লে গেলে সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি শিখিয়েছ এসব?

ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে কাটতে এক সময় পেন্সিলও মারাত্মক রকমের সূক্ষ্ম ধারালো হয়ে উঠে। ভয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ অনেক সময় অভয় না পেলেও নির্ভয় হয়ে উঠে। সে এবার মুখ তুলে বললে, আজ্ঞে না। আমি শেখাই নাই। এসব আজকাল কাউকে শেখাতে হয় না হুজুর, দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা নিজেরাই শিখেছে। ভয়ে পশ্চাৎ-অপসরণের শেষ সীমায় এসে আশ্চর্য রকমের ধৈর্য এবং সাহস উপলব্ধি করছিল সে, শান্তভাবে ধীরতার সঙ্গেই সে জবাব দিলে।

সাহেব আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলেন, ধীরানন্দ সম্পর্কে। সীতারাম নির্ভয়েই উত্তর দিয়ে গেল। একটু মিথ্যা কথা বললে না। এর পর সাহেব চ'লে গেলেন।

সীতারাম আপনার পাঠশালার দাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। মাথার মধ্যে সব যেন তার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কোন স্পষ্ট ভাবনা নাই। শুধু একটা ক্ষোভ যেন ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে।

ঢং-ঢং ক'রে ঘড়িতে চারটে বেজে গেল।

সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। হঠাৎ ঘর-দুয়ার বন্ধ করতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ আবার বসল চেয়ারে। ব'সেই রইল।

জ্যোতিষ সাহা এল। —পণ্ডিত!

আসুন।

হ্যাঁ, এলাম। ব্যাপার যে বেজায় খারাপ হয়ে গেল পণ্ডিত।

সীতারাম বললে, কি করব বলুন?

জ্যোতিষ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আমাকেও একদফা শাসিয়ে গেলেন, তুমি ঘর দিয়েছ কেন? তা আমি বললাম, হুজুর, আমি তো ঘর ভাড়া দিয়েছি। একটু চুপ ক'রে থেকে জ্যোতিষ আবার বললে, আমার আবার মহা মুশকিল তো! আমি তো গবর্মেণ্টের চাকর একরকম। মদ-গাঁজার লাইসেন্স রাখি। আমাকে হুকুম হ'ল, ভাড়া তুলে দাও।

সীতারাম বললে, আমাকে একটা মাস সময় দেন। একটা জায়গা কিনে, চালা তুলেও আমি পাঠশালা চালাব। পাঠশালা আমি বন্ধ করব না।

কয়েকদিন পর। আবার একটা ধাক্কা এল।

কানাই রায়—সীতারামের উপপদ-তৎপুরুষ, সে বললে, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয় সীতারাম, বুঝলে তো! সাহেবের হাতে পায়ে ধরলেই হ'ত। তা—। কানাই ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র শব্দ করলে। তারপর আবার বললে, তা মাথাটা তোমার শক্ত হোক আর না হোক, গোঁ শক্ত বটে।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল বাবুদের বাড়িতে নিজের ঘরে। তক্তাপোশের উপর তার সামনেই রাখা ছিল, তার সন্দীপন পাঠশালার ক্লক-ঘড়িটা। ঘড়িটার কাচ ভেঙে গিয়েছে। মেঝের উপর এক পাশে

প'ড়ে আছে একখানা ভারতবর্ষের বড় ম্যাপ। ম্যাপখানা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাচ-ভাঙা ছবি কখানা প'ড়ে রয়েছে এক পাশে। ব্ল্যাক-বোর্ডটার এক দিকের ফ্রেমের জোড় ভেঙেছে।

আজ ভোরে পাঠশালা খানাতল্লাস হয়ে গিয়েছে। খানাতল্লাসীর পর জ্যোতিষ সাহা বলেছে, পণ্ডিত, জিনিসপত্র তোমার নিয়ে যাও ভাই। আমাকে মাফ কর তুমি। সীতারাম জ্যোতিষকে দোষ দিতে পারে নাই। কথা বলতে গিয়ে সাহার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। একান্তে নির্জনে তাকে বলেছে, তুমি যদি পাঠশালার উপযুক্ত ঘর ভাড়া পাও পণ্ডিত, তবে দেখো, ভাড়াটা আমি মাসে মাসে দোব।

সীতারাম সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পাঠশালার দাওয়ায় ব'সে শুধু কেঁদেছে। ব'সে ছিল সে ছেলেদের অপেক্ষায়। তার নিজের সমর্থ দেহেও যেন একবিন্দু শক্তি ছিল না। ছেলেরা এলে, ছেলেদের নিয়ে এসব ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে যা হয় ব্যবস্থা করবে, এই সে ভেবেছিল। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত ছেলেরা কেউ এল না। ছেলেদের বাপেরা একে একে এসেছে তাদের পরিবর্তে, সকলে ছেলের সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। বড় স্কুলের সংলগ্ন পাঠশালায় তাদের তারা ভর্তি ক'রে দেবে। এখানে পড়ানো আর নিরাপদ নয়। অবশ্য প্রত্যেকেই বললে, দোষ তোমার নাই, সে আমরা জানি, পণ্ডিত। ছেলেটাও কাঁদছে। তোমাকে ভালও বাসে আর বড় ইস্কুলের মাস্টাররা আমাদের ছেলেদিগকে হেণ্টাকেণ্টাও করে। কিন্তু করি কি বল?

বেলা চারটে পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ছেলের নাম খাতায় রইল। জ্যোতিষ সাহার ভাইপো, আর তিনটি ছেলে বিনা বেতনের ছাত্র। আর আছে আকু—আকুর পড়ার বিষয়ে তাঁদের কোন চিন্তা নাই।

ঠিক এই সময় এল দেবু আর শ্যামু। সঙ্গে কানাই রায় মজুর এবং বাড়ির গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে মায়ের নির্দেশে। পাঠশালার

জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য। তারাই সব গুছিয়ে নিয়ে এল। সীতারাম পুতুলের মত সঙ্গে এল শুধু। মা তাকে অনেক অনুরোধ ক'রে খাওয়ালেন। সে খাওয়াও নাম মাত্র। ভাঙা ঘড়িটা সামনে রেখে সে নির্বোধ স্তম্ভিতের মত ব'সে আছে। ওই ঘড়িটার সঙ্গে জীবনের চলাটাও যেন হঠাৎ তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে আজ সকাল থেকে।

বৈকালে অভ্যাসমত সে গিয়ে ঝরনার ধারে বসল। ধীরানন্দের জেল হওয়ার খবর যেদিন এসেছিল, সেদিন যেমন সে উদাস দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়েছিল, সেই দৃষ্টিতে, বোধ হয় সেদিনের চেয়েও গভীরতর ঔদাসীন্য-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ছিল। সেদিন তবু ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ধীরাবাবুর মুখ। আজ দৃষ্টির সামনে কিছুই ভেসে উঠল না। সব হারিয়ে গিয়েছে, সব খা-খা করছে।

সীতারাম !—কেউ পিছনে থেকে ডাকলে। পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আজ ঠিক ধরতে পারলে না সীতারাম। পিছন ফিরে দেখলে রজনীবাবু আসছেন। সীতারাম একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

ব'স তুমি, ব'স। রজনীবাবু তার পাশেই বসলেন। তারপর বললেন, আমি শুনেছি সব।

সীতারাম চুপ ক'রে রইল।

রজনীবাবু বললেন, ইচ্ছে ছিল সার্চের পরই একবার পাঠশালায় যাই। নিজের চোখে দেখে আসি। কিন্তু এখানকার মাস্টার মশাইরা বারণ করলেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, শুনেছিলাম তুমি রোজ এই ঝরনার ধারে বেড়াতে আস, তাই এলাম।

সীতারাম নির্বোধের মত শুধু প্রশ্ন করলে, আজ্ঞে ?

রজনীবাবু তার পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে এবার বললেন, তুমি বড় মুষড়ে গিয়েছ। এমন মুষড়ে পড়লে তো হবে না।

সীতারাম চোখ বুজে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না। একটু হাসতেও চেষ্টা করলে।

রজনীবাবু বললেন, মণিবাবুর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল—জমিদার মণিলালবাবু?

সীতারাম মনে করতে পারলে না কথাটা, সবিস্ময়ে বললে, আজ্ঞে কই, কিছুই তো—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল, মনে পড়েছে।

কি বলেছিলে তুমি তাঁকে?

সীতারাম অকপটেই সমস্ত বললে।

তিনিই এ ব্যাপারের মূলে আছেন। তিনিই জানিয়েছেন এসব পুলিস সাহেবকে।

সীতারাম এবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রজনীবাবু বললেন, আগে যে দরখাস্তটা হয়েছিল, সেটা আমার রিপোর্টেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কোনও গণ্ডগোল আর হ'ত না।

সীতারাম শক্ত হয়ে উঠল। মণিলালবাবুর দ্বারা এ ব্যাপারটা ঘটেছে, এই সংবাদটাই তাকে শক্ত ক'রে তুললে। সে একটু হেসে বললে, আমার অদৃষ্ট।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রজনীবাবু বললেন, কি করবে এখন?

সীতারাম প্রশ্ন করলে, পাঠশালা আমাকে আর করতে দেবে না?

ইচ্ছে করলে গভমেণ্ট না পারে কি? বন্ধ করতে পারে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে, কিন্তু—। হাসলেন রজনীবাবু, বললেন, সে করবে না, নিজেদেরও একটা লজ্জা আছে। একটা পাঠশালা—। নাঃ, ততদূর করবে না। তবে এডের টাকাটা বন্ধ হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, তবে এখন কিছুদিন চুপ ক'রে থাকাই ভাল। বাবুদের ছেলে পড়াচ্ছ, ওই সঙ্গে আরও দু-চারটি ছেলে যদি নাও, তবে চলবে কোন রকমে তোমার। তা ছাড়া

দুপুরবেলা যদি সাবরেজেস্ট্রি অপিসে লোকজনের দরখাস্ত-দলিল লিখে দাও, তাতে ভালই হবে তোমার। পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। আমি সবরেজিস্ট্রারবাবুকে বলেছি। তিনিও ব্যাপারটা শুনে দুঃখিত হয়েছেন। বললেন, বেশ, দেবেন পাঠিয়ে।

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, দেখি।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই বললে, মা ডেকেছেন তোমাকে।

ধীরানন্দের মা এ ব্যাপারটায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন মতেই ভুলতে পারছিলেন না যে, এর জন্য দায়ী ধীরানন্দ। ধীরানন্দ জেলে গিয়েছে, ধীরানন্দকে সীতারাম শ্রদ্ধা করে, ধীরানন্দের ভাইদের পড়ায়, তাদের বাড়িতে থাকে, তাই তার এই দুর্ভাগ্য। বহুকষ্টে বেচারা চাষী সদ্‌গোপের ছেলে সামান্য লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের জন্য পাঠশালা খুলেছিল। সেটিই শুধু ভেঙ্গে গেল নয়, বেচারার বোধ হয় ওই পথ ধ'রে চলাও এ যাত্রার মত শেষ হয়ে গেল। এইটুকু দায়িত্বই শুধু তাঁদের নয়, আরও দায়িত্ব আছে, সীতারাম তো শুধু ছেলেদের গৃহশিক্ষকই নয়, সে তাঁদের প্রজা। তিনি তাকে ডেকে ধীরানন্দের পড়ার ঘরে বসালেন। বললেন, ব'স বাবা। ও-বেলা থেকে তুমি ভাল ক'রে খাও নি। আগে জল খাও দেখি।

সীতারাম আপত্তি করলে না। ক্ষুধাও ছিল, পেট ভ'রেই সে খেলে। মা বললেন, দেখ বাবা, আমি ভুলতে পারছি না যে, ধীরার জন্যে তোমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হ'ল।

সীতারামের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। সে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না মা। ব্যাপারটা করেছেন মণিলালবাবু।

মণি-ঠাকুরপো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সে সমস্ত কথা বললে।

মা হাসলেন, তিক্ত ধারালো হাসি। এই হাসি সীতারামের কাছে আশ্চর্য মনে হয়। এ হাসি এঁরা ছাড়া কেউ হাসতে পারে না।

মা বললেন, জান বাবা, বনের সিংহ ম'রে যায়, তখন অন্য বনের সিংহ এসে এ বনের আশ্রিতদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু তারও প্রতিকার একদিন হয়। সিংহের শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তারা এর শোধ নেয়। গম্ভীরমুখে মা ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলেরাও একদিন বড় হবে। আসুক ফিরে ধীরা।

সীতারাম নীরবে ব'সে রইল। আশ্চর্যের কথা, মায়ের এই কথাগুলি তার কাছে অত্যন্ত কঠোর ব'লে মনে হ'ল।

মা বললেন, শোন বাবা; যার জন্যে আমি ডেকেছি তোমাকে। তুমি কি করবে? পাঠশালা তো উঠে গেল।

সীতারাম ব্যস্ত হয়ে বললে, আজ্ঞে না, উঠে যায় নাই, তবে হ্যাঁ, এড বন্ধ হবে।

ছেলেরাও তো সব সার্টিফিকেট নিয়ে চ'লে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে?

সীতারাম এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। মা বললেন, আমাদের জন্যেই তোমার এ উপার্জনের পথ বন্ধ হ'ল। আমি সমস্ত দিনই ভাবছি। তুমি এক কাজ কর বাবা। আমাদের সেরেস্তায় তুমি কাজ কর। তোমাদের গ্রাম, এ পাশে সুরভিপুর, রামচন্দ্রপুর, এই তিনখানা গ্রাম কাছে কাছে রয়েছে। এর আদায় নাও, সদর সেরেস্তার কাগজপত্রও দেখ। তাতে তোমার পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। মাইনে আছে, তহুরী আছে, খারিজ ফীয়ের অংশ আছে।

ভাল হবে। ভাল হবে।—উপপদ-তৎপুরুষ কানাই রায় কখন এসে দরজার মুখেই বসেছে উপু হয়ে।

মা বললেন, তা ছাড়া বাবা, আমারও একটা স্বার্থ আছে! তুমি আমাদের সন্তানতুল্য। শুধু তাই নয়, সৎ প্রকৃতি তোমার, সাধু লোক তুমি। আমাদের নায়েববাবুর শরীর ভেঙেছে। ওঁর পর তোমার হাতেই সব ভার দিতে চাই আমি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ধীরা যে পথ ধরল, তাতে ওর ওপর আর আমার ভরসা নাই।

সীতারাম এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে কল্পনায় নায়েব-জীবনের রূপ তার সামনে ফুটে উঠল। জমিদারবাড়ির নায়েব! পিছনে কানাই রায় যাবে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাঁধে লাঠি নিয়ে। তক্তাপোশের উপর ছোট গদি-পাতা আসনে ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে বসবে।

কানাই রায় বললে, লেগে যাও, বুঝলে, লেগে যাও। শিখতে ক'দিন লাগবে? আমি সব শিখিয়ে দোব।

মা বললেন, সীতারাম!

সীতারাম চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ভেবে দেখি মা। সম্মতি দিতে গিয়েও যেন তার গলায় আটকে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল।

জমিদার-বাড়ির নায়েবি, তার মন কিছুতেই খুশি হতে পারছে না! তার বহু যত্নে গড়া—অনেক সাধের রত্নহাট সন্দীপন পাঠশালা। ওই পাঠশালাটি ছাড়া আর কিছুতেই তার মন উঠবে না। বোধ হয় রাজ্যপদ পেলেও না। পাঠশালাটি জ'মে উঠেছিল বর্ষার ধানক্ষেতের মত। ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতে ধানচারা রুয়ে দেয়, প্রথম প্রথম চারাগুলি দেখা যায় না—ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতকে জলভরা পতিত জমির মত মনে হয়। দেখতে দেখতে ধানের চারাগুলি ঝাড় বেঁধে সবুজ হয়ে ক্ষেতকে ভ'রে দেয়। দূর থেকে তখন মানুষের চোখে ঠেকে

তার সবুজ লালিত্য। চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পাঠশালাটিও তেমনই ভাবে জ'মে উঠেছিল। সাহাপাড়া, স্বর্ণকারপাড়া, কৈবর্তপাড়ায় সাড়া জেগেছিল। ঘরের মেঝে বারান্দা ভ'রে উঠেছিল ছেলেতে। কলরব ক'রে তারা পড়ত, সুর ক'রে নামতা বলত—দুই-একে—দুই, দুই-দুকুনে—চার, তিন-দুকুনে—ছয়। পাড়ার লোকে বলত, পাঠশালায় পড়ছে। যাত্রীরা পথে যেতে থমকে দাঁড়াত। যারা পড়তে জানে, তারা ওই সাইনবোর্ডটা পড়ত—রত্নহাট সন্দীপন পাঠশালা, শিক্ষক সীতারাম পাল।

আট

পরের দিনও সীতারাম লাঠি ছাতা এবং লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঠিক ভোর-বেলায় উঠে রত্নহাটে এল। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই এসে শ্যামু এবং দেবুকে পড়াতে বসল।

কিছুদিন হ'ল শ্যামু বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। দেবু এখনও বাড়িতে পড়ে। দশটার সময় তাদের ছুটি দিয়ে সীতারাম একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে। স্নানের তাড়া নাই। পাঠশালা বন্ধ। চোখে তার জল এল, চোখের জল গোপন করার জন্যই সে তক্তাপোশের উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার উঠে বসল। কিছুতেই সে শান্তি পাচ্ছে না। হঠাৎ কি মনে হ'ল—ভাঙা ঘড়িটা দেওয়ালে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটাকে চালাবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলে সে। একবার ডাইনে ঠেলে, তারপর ঈষৎ বাঁয়ে ঠেলে, দেওয়াল এবং ঘড়িটার পিঠের মধ্যে খানিকটা কাগজ দিয়ে, পেণ্ডুলাম দুলিয়ে শব্দ শুনলে।

হ্যাঁ, এইবার শব্দটা যেন অনেকটা এসেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ঘড়িটার দিকে। চলছে ঘড়িটা। তারপর বসল সে ছেঁড়া ম্যাপটা নিয়ে। খানিকটা ময়দার আঠা চাই, খানিকটা পাতলা ন্যাকড়ার ফালি। তা হ'লে এটাও দাঁড়াবে।

পণ্ডিত!

কে?

শিশুশ্রেণীর একটি ছাত্রকে কোলে ক'রে এসেছে তার বিধবা মা। একবার হাতটি দেখ দেখি পণ্ডিত। কাল রাত থেকে জ্বর। তা তুমি না দেখলে তো আমাদের হয় না বাবা। দেখ একবার।

এই কয়েক বৎসরে সীতারাম এই একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। সে নাড়ী দেখতে শিখেছে। সর্দি-পিত্ত-বায়ু ইত্যাদির আধিক্যদোষও নির্ণয় করতে পারে।

কই, দেখি? দক্ষিণ হস্ত। ডান হাত কোন্‌টি হে? অ্যাঁ? যে হাতে ভাত খাও। বাঃ! বাঁ হাত ছেলেটির কনুইয়ের ভাঁজের তলায় দিয়ে ডান হাতে সে নাড়ী টিপে ধরলে।

জ্বর যে অনেকটা—এক শো এক আন্দাজ হবে। নেবে দুদিন বাপু। পিত্তদোষ রয়েছে।

ছেলেটি বললে, পাঠশালা বসবে না স্যার?

ম্লান হাসি হেসে পণ্ডিত বললে, বসবে বই কি। ভাল হয়ে ওঠ, উঠে চ'লে আসবে।

আমাকে টিপিনের ঘণ্টা বাজাতে দিয়েন স্যার।

দোব। তুমিই বাজাবে ঘণ্টা। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মাস্টার বললে, ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

সে আবার বসল ম্যাপটা নিয়ে। একটু ময়দার আঠা চাই, পাতলা ন্যাকড়া খানিকটা। বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য সে উঠল।

কে? কে যেন উঁকি মারছে বাইরে থেকে!

আমি স্যার্। আকু এসে দাঁড়াল সামনে।

আকু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আকু দরজার বাজুটি ধ'রে তার উপরেই মুখটি রেখে বললে, পাঠশালা কোথা বসবে স্যার্?

পাঠশালা?

হ্যাঁ।

সীতারাম চুপ ক'রে রইল। কি উত্তর দেবে সে? পাঠশালা বসবে না—এ কথা কিছুতেই তার মুখ থেকে বেরুতে চাচ্ছে না।

আকু বললে, আমি স্যার্, আপনার পাঠশালা ছাড়া আর কোথাও পড়ব না—কোথাও না।

ব'স, এইখানেই ব'স।

আকু বসল। একবার বইটা খুললে, তারপর উঠে এসে পণ্ডিতের পাশে বসল। ময়দার আঠা নিয়ে আসব স্যার্? আঠা দিয়ে জুড়ে দিন কেন। আনব আঠা?

আনতে পারবে?

হ্যাঁ। ঠিক নিয়ে আসব আমি।

বাবুদের বাড়িতে ধীরাবাবুর মাকে বলবি, পণ্ডিত একটু ময়দার আঠা আর একটু ন্যাকড়া চাইলেন।

চ'লে গেল আকু। ছুটল সে। ব্ল্যাকবোর্ডের ভাঙা জোড়াটায় একটা পেরেক মারতে হবে। তা হ'লেই চলবে। দড়ি বাঁধলেও চলতে পারে। একটা পেরেক খুঁজে ফিরতে লাগল সীতারাম।

কে? এ কি, আপনি?

আকুর মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আকুর মা মানুষটি বড় ভাল এবং বিচিত্র। ছেলেকে আদর দিয়ে

নষ্ট করার মত যোগ্যতার সঙ্গে আর একটি দুর্লভ যোগ্যতা তাঁর আছে। পৃথিবীর লোককে সুদুর্লভ আদর করতে জানেন। স্বভাবটা তাঁর ঠিক একটি মধুর হাঁড়ি এবং সে হাঁড়িটি গল্পের মধুদাদার দেওয়া অক্ষয় ভাণ্ডের মত অফুরন্ত। সেই অফুরন্ত মিষ্টরস যার জিহ্বায় ঢালতে শুরু করেন, তাকে শেষ পর্যন্ত তোতলা ক'রে ছেড়ে দেন। আকুর মায়ের হাতে একটি বাটিতে খানিকটা ময়দার আঠা আর খানিকটা ন্যাকড়া। আকুর মা হেসে বললেন, সে কই?

আকু দেবুদের বাড়ির মধ্যে গিয়েছে, একটু আঠা আর—

আকুর মা আঠার বাটিটা নামিয়ে দিলে, বললে, আঠা এই নাও। সে তোমার বুঝি বাবুদের বাড়ি গিয়েছে? সে গিয়েছিল আমার কাছে। বলে, ময়দার আঠা চাই। আঠা করতে দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, আকু নিজের পোশাকী কাপড় দাঁত দিয়ে কাটছে। ও কি রে? না, মাস্টারের পাতলা ন্যাকড়া চাই। থাম্, থাম্। আমি দিই, আমি দিই। সে মানে না, বলে, এখুনি দাও। তখুনি বাক্স খুলে ছেঁড়া কাপড় বার ক'রে কাপড় ছিঁড়ে দিই, তবে ক্ষান্ত। ওদিকে ময়দার আঠা পুড়ে গেল, আবার বসালাম আঠা। তা বললে, তবে তুমি দিয়ে এস। আমি যাই।

পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে রইল, এ কথার কোন জবাব দিতে পারলে না। আকু! চণ্ডালের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন নাকি শিব! এ কি তাই? চোখ ফেটে তার জল এল।

আকুর মা বললে, আকুর এই কাপড়খানি কিন্তু তোমাকে রিপু ক'রে দিতে হবে পণ্ডিত। বেশি নয়। এই দাঁত দিয়ে একটু সবে কেটেছিল। তোমার হাতের রিপু বড় ভাল।

এই একটি বিদ্যা সীতারামের আছে। ছেলেবেলা থেকেই সে মাতৃহীন, বাপ চাষবাসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন থেকেই তার এ বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল। জামার বোতাম সেলাই থেকে শুরু,

ক্রমে ছোটখাটো ছেঁড়া সেলাই করত নিজে হাতে। এখন যেন এটাতে একটা শখ প'ড়ে গিয়েছে। শিক্ষক-জীবনে এটা তাকে কিছু সাহায্যও করে। পাঠশালায় পড়ানোর অবসরে ব'সে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে দামী কাপড় রিপু করে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে, তাতে সে আনন্দও পায়, আবার বিনিময়ে লোকের স্নেহও সে অর্জন করে।

পণ্ডিত বললে, দেবেন। ক'রে দোব।

এই নাও, দিয়ে গেলাম। হ'লে আকুর হাতে তুমি দিও।

আচ্ছা।

এই যে! আকুর মা বললেন, এই যে, কোথা ছিলি? অ্যাঁ?

এদের ডাকতে গিয়েছিলাম। আকু এসে সামনে দাঁড়াল, দুপুর রৌদ্রে ঘুরে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আকুর পিছনে এসে দাঁড়াল তিনটি ছেলে—জ্যোতিষের ভাইপো, কৈবর্তদের গোপাল এবং হরিলাল। অভ্যাসমত একমুখ হেসে সে বললে, ডেকে নিয়ে এলাম সব।

তারপর ছেলেদের বললে, ব'স, সব ব'স। আজকে এইগুলো মেরামত করতে হবে।

সীতারামের মুখে কোন কথা জোগাল না। ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেল মেরামতের কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেও তাদের সঙ্গে কাজে লাগল।

কানাই রায় এসে বললে, চান কর, খাও। বাড়িতে ঠাকুর ব্যস্ত হয়েছে। ভাত নিয়ে ব'সে থাকবে কত? তারপর সে ঘরের মধ্যে ঢুকে ম্যাপ মেরামত করতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের পিচ কেটে বললে, আবার এই নিয়ে বসেছ?

সীতারাম উত্তর দিলে না।

রায় এবার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত ভঙ্গী ক'রে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললে, মা যা বললেন, তাই কর সীতারাম। ভাল হবে। তাকে

জমিদারির কাজে ঢুকিয়ে কানাই রায়ের কি সুবিধা হবে, সে সেই জানে। হয়তো তাকে ভালবাসে। কিংবা ভাবে সীতারাম নায়েব হ'লে তার অধিকার বাড়বে। সেই তো তাকে এনেছে এ বাড়িতে, কিংবা হয়তো আর কিছু।

উত্তর না পেয়ে কানাই রায় ক্ষুব্ধ হ'ল, বললে, আবার একদিন এসে দেবে ছিঁড়ে।

উত্তর দিলে আকু। বললে, আবার আঠা দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে জুড়ব, না কি স্যার্? আবার ছিঁড়ে দেয়, আবার জুড়ব, না কি ভাই? এবার সে বললে নিজের সঙ্গীদের।

তারা সকলেই বললে, হ্যাঁ।

কানাই রায় বললে, তাই কর। ছেঁড়া কাঁথার মত সেলাইই কর, সেলাইই কর।

কানাই রায় সত্যই দুঃখিত হয়েছিল। সীতারামকে সে ভালবাসে এবং তার উপর একটা অধিকারের দাবি সে মনে মনে পোষণ করে। সে দাবি কিন্তু তার গোপন দাবিতে পরিণত হয়েছে। তাকে প্রকাশ করতে সে সাহস করে না। প্রথম দিন যখন সীতারাম এ বাড়িতে এল এবং মা ঠাকরুণ যখন তাকে বসবার জন্যে আসন দিতে বললেন, মুখে বললেন, তুমি হ'লে এ বাড়ির ছেলেদের শিক্ষাগুরু, সেই দিন সেই মুহূর্তেই বোধ করি তার দাবিকে সে সসঙ্কোচে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর থেকে এই কয়েক বৎসর সে দেখেছে, সীতারাম আর তার মধ্যের পার্থক্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। সীতারামের কথাবার্তা রসিকতা সব আলাদা। অথচ সীতারামের সঙ্গে বিবাদ-কলহেরও অবকাশ নাই। সীতারাম তাকে অবহেলা করে না। সীতারামের কাজকর্মের প্রসঙ্গের মধ্যে কোন তর্ক তুলবার তার অবকাশ নাই। মনে

মনে সে দুঃখ পেত। তাই আজ মা যখন তাকে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করবার জন্য বললেন, তখন সে এই কারণেই খুশি হয়েছিল, সীতারাম তার নাগালের মধ্যে আসবে। হোক না কেন নায়েব, কানাই রায়ের পরামর্শ তাকে নিতে হবে। তাই সে এখানেই ক্ষান্ত হ'ল না। সীতারামের বাড়িতে কথাটা জানিয়ে এল। তার পণ্ডিত-দাদাকে বললে। জনকয়েক প্রবীণকেও জানালে।

"সীতারামকে বল তোমরা। তোমাদের আপনার জন। ছোকরার ভাল হবে। তা ছাড়া, তোমাদের নিজের লোক যদি নায়েব হয়, তবে, ধর গিয়ে, তোমাদেরও সুবিধে।"

কথাটা সকলেরই মনে লাগে। কানাই রায়ের মত গোপন এবং অজানিত ক্ষোভ খানিকটা সকলেরই ছিল। হঠাৎ বাড়ির একটা ছেলে যদি গেরুয়া প'রে ব্রহ্মচারী সেজে বসে, তবে যেমন অস্বস্তি অনুভব করে মানুষ, তেমনই অস্বস্তি অনুভব করত সকলে।

ভোরবেলাতেই দেখা হ'ল পণ্ডিতদাদার সঙ্গে। শান্ত মানুষটি বললে, কাল রাত্রে আর গেলাম না। কানাই রায় এসেছিল। বলছিল,—

সীতারাম বললে, না দাদা, সে আমি পারব না।

পণ্ডিত দাদা নিজে পাঠশালার পণ্ডিত, আদায়ের সময় জমিদার-সেরেস্তাতেও গিয়ে বসে। প্রথম প্রথম সে গিয়ে যখন বসত, তখন তারও মন বিরূপ হয়ে উঠত, কিন্তু তবু তাকে যেতে হ'ত। বারোয়ারি কালীতলায় পাঠশালা বসে, জমিদার তার সেবাইত হিসাবে মালিক, সেই বাধ্যবাধকতায় গোমস্তা তাকে ডাকত আদায়ের হিসাব-নিকাশে সাহায্যের জন্য। আর গ্রামের লোকেও এটা পছন্দ করত, তারা বিশ্বাস করত, তাদেরই গ্রামের ছেলের কষা হিসাবে ভুলের প্যাঁচ থাকবে না। পণ্ডিতদাদা সীতারামের বিতৃষ্ণা বুঝতে পারলে, সে একটু নীরব হয়ে রইল, তারপর বললে, হুঁ। তা পণ্ডিতি ক'রে আর ওসব ভাল লাগবে

না। তা ছাড়া বড় পাজী কাজ, দশজনের সঙ্গে হাঙ্গামা, সে হবেই। তা বেশ। তা—

আবার একবার থামল পণ্ডিতদাদা, তারপর বললে, কিন্তু পুলিস যখন হাঙ্গামা একবার করলে, তখন—

সীতারাম বললে, দেখি।

তা আমি তো চ'লে যাব। শ্বশুর বলছেন, বুড়ো হয়েছি, এইবার দেখেশুনে নাও, তা তুই গাঁয়েই আমার পাঠশালা নিয়ে ব'স্ না কেনে ?

সীতারাম বললে, তোমার মেজভাইকে বসিয়ে দাও তোমার পাঠশালায়। আমি দেখব, ওখানেই—ওই রত্নহাটেই দেখব দাদা। বারণ ক'রো না তুমি।

দাদা বললে, এটা তোর খ্যাপামি। সেও পাঠশালা, এও পাঠশালা। তাতে এখানে যদি নিরাপদে থাকিস, ঘর বার দুই চলে, তবে ওই পাঠশালার ওপর এত ঝোঁক কেনে ?

এ কথার উত্তর দিলে না সীতারাম।

নয়

দাদার শেষ কথাটির উত্তর দেয় নাই সীতারাম। রত্নহাটে সন্দীপন পাঠশালার উপর তার আশ্চর্য মমতা। পৈতৃক ভিটের উপর মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, তেমনই একটা আকর্ষণ আছে। অনেক সময় ভেবেছে, গ্রামেই যদি 'সন্দীপন পাঠশালা' নাম দিয়ে পাঠশালা করে, তবে সব গোল বোধ হয় মিটে যায়। কিন্তু না। মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করতে থাকে। কিছুতেই মনঃপূত হয় না।

সন্দীপন পাঠশালা যদি রত্নহাটেই না থাকে, তবে আর সন্দীপন পাঠশালা কিসের ?

জীবনে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, নর্মাল পাস ক'রে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে সে বিদেশে যাবে। শিক্ষিত সমাজে স্থান পাবে, কত মহৎ লোকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হবে, তাদের সাহচর্যে কত নূতন শিক্ষালাভ করবে। ছুটিতে গ্রামে ফিরে আসবে। গ্রামের লোকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন করবে। গুরুজনদের সে প্রণাম করবে, বন্ধুজনকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে, কনিষ্ঠদের সস্নেহে আশীর্বাদ দেবে। গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুদের প্রীতিসম্ভাষণ, কনিষ্ঠদের প্রণাম সমস্ত কিছুর মধ্যে আরও কিছু থাকবে। মানুষের জীবনের সেইটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কাম্য। থাকবে শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গুরুজনেরা বলবে, হ্যাঁ, তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। ছেলেদের বলবে, দেখ, সীতারামকে দেখে শেখো। বন্ধুজনের প্রীতিসম্ভাষণের মধ্যেও স্বীকৃতি থাকবে, ভাই, তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠদের প্রণামের মধ্যে অকথিত কামনা থাকবে, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মত হতে পারি।

সে আশা তার আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে। ভাগ্যও বটে, আবার নিজের অক্ষমতাও সে স্বীকার করে। তাই তো সে জীবনে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতার উপযুক্ত পাঠশালার পণ্ডিতের পদ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে রত্নহাটে পাঠশালা করেছে, তার কারণ এই গ্রামের চেয়ে রত্নহাট সমাজের মর্যাদা অনেক বেশি। শিক্ষিতের সমাজ, মর্যাদাবান বিত্তশালীর সমাজ রত্নহাট। তা ছাড়া, এতে তার বিদেশে চাকরি করার সাধ আংশিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। ভোরে উঠে যায়, রাত্রি দশটায় ফেরে, সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার—এই ছটা দিন গ্রামবাসীর কাছে সে বিদেশবাসীরই সমান। তাদের সঙ্গে দেখা হয়

রবিবারে। রবিবার ছুপুরবেলা, গ্রাম্য মজলিসে গিয়ে বসে, রত্নহাটের গল্প করে। তাদের জমিদার-বাড়ির গল্প, রীতি-নীতির কথা, তাঁদের অভিজাতসুলভ মর্যাদাজ্ঞানের কথা বলে, মণিবাবুর গল্প করে, বড় ইস্কুলের সংবাদ বলে, সেখানকার সমাজে দেশদেশান্তরের যে সব সংবাদ আসে, সে সবও বলে। তারা খানিকটা বিস্মিত হয় বইকি। মুগ্ধ হয়ে শোনে। আবার বাজারদরের কথাও বলে, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান-চালের নির্ভুল দর তাদের জানায়। তাদের কাজে লাগে। আবার জানায়, রত্নহাটে এবার মোটরকার আসছে, বড় ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রত্নহাটের বড়বাবুরা কলকাতায় মোটর গাড়ি কিনে ফেলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে। আরও বলে, শিবকিঙ্করদের মত বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার বিরোধের কথা। বলে, আমি ওসব বাবুদের কেয়ার করি না। এই সবের মধ্যে তার বিদেশে চাকুরির আকাঙ্ক্ষা খানিকটা যেন মেটে।

এ ছাড়া, এতদিন রত্নহাটে পাঠশালা ক'রে আরও একটা আকর্ষণ তার হয়েছে। আজ কয়েক বৎসরই পাঠশালা করছে সে। রত্নহাটের ছেলেদের সে ভালবেসেছে। যে সব গৃহস্থদের ছেলে পড়ে, তাদের সঙ্গেও তার একটা ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধে হয়েছে। প্রথম সে সাহা স্বর্ণকার এবং কৈবর্তদের ছেলে নিয়েই পাঠশালা করেছিল অনেকটা জেদের বশে। বড় ইস্কুলের হেড-মাস্টার তাকে ঠাট্টা ক'রেই বলেছিলেন, ওদের নিয়েই পাঠশালা করগে, পুণ্য হবে, অজ্ঞানদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার পুণ্য হবে। সেই কথায় সে অনেকটা জেদের বশে এদের নিয়ে পাঠশালা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আশাও করেছিল, এদের ছেলেদের, যাদের ওই বড় ইস্কুলের পণ্ডিতেরা অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে, তাদেরই কৃতী ক'রে তুলে সে নিজের শিক্ষকতার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রাণপাত ক'রে পড়াবে সে। বৎসর বৎসর এদের ছেলেদেরই

বৃত্তি পাওয়াবে সে। আপনার মনেই সে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে নিত। নর্মাল ইস্কুলে পড়বার সময় সে শিক্ষকদের কাছে শুনেছিল, পণ্ডিত বোপদেবের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প। বোপদেবের শিক্ষক তাঁর স্থূলবুদ্ধির জন্য হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তার কিছু হবে না। বোপদেব মনের দুঃখে দেশত্যাগ ক'রে চলেছিলেন। পথে তিনি এক সরোবরের পাথরে বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে দেখলেন, পাথর কেটে ছোট ছোট বাটির আকারের গর্ত করা রয়েছে। বোপদেব আশীর্বাদ করলেন সরোবরের মালিককে। দীর্ঘজীবী হোন তিনি। সুবিবেচক মালিক, নিঃস্ব পথিকদের খাবার জন্য চমৎকার জায়গা ক'রে রেখেছেন। যাদের সঙ্গে থালা বাটি গেলাস নাই, তারা অনায়াসে পরমানন্দে এই পাথরকাটা আধারে ভিজিয়ে থিতিয়ে খেতে পারবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁর ভ্রম ভাঙল। দেখলেন; নগরের মেয়েরা এসে কলসীতে জল ভ'রে সেই গর্তগুলির উপর বসিয়ে রেখে স্নান করতে লাগল। তখন তিনি বুঝলেন, এই গর্তগুলি মালিক তৈরি করান নাই, দিনের পর দিন একই স্থানে কলসী রাখার ফলে, ওই কলসীর ঘর্ষণে সৃষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত তাঁর মনে হ'ল, পাথর যদি ক্ষয় হয় এই ভাবে নিয়মিত ঘর্ষণে, তবে তাঁর বুদ্ধি, সে হোক না কেন যত স্থূল, তাই বা অধ্যবসায়ের ফলে নিয়মিত পাঠাভ্যাসে কেন তীক্ষ্ণ হবে না? সেইখান থেকে তিনি ফিরলেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। তার ফলেই বোপদেব ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মুগ্ধবোধ-প্রণেতা বোপদেব হলেন।

এই গল্প মনে ক'রে সে ওদের কৃতী ছাত্র তৈরি করবার জন্য পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেছিল। ছাত্রেরা কেউ কৃতী হতে পারে নাই, তার আশা সফল হয় নাই। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে, সে ওই ছেলেগুলির সঙ্গে, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিচিত্রভাবে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। তারা তাকে ভালবাসে। কতখানি ভালবাসে, সে তার হিসেব

করে না, কিন্তু তার ভালবাসার পরিমাণ সে জানে। তারা তাকে দলিল লিখতে, দরখাস্ত লিখতে ডাকে, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হ'লে নাড়ী দেখতে ডাকে, রেশম-পশমের কাপড় রিপু করতে দেয়। তার মধ্যে স্বার্থও আছে, ভালবাসাও আছে। তার প্রকাশ হয়, তাদের সাদর সম্ভাষণের মধ্যে, নবান্নে লক্ষ্মীপূজায় তারা মিষ্টান্ন দেয় তার মধ্যে। কৈবর্তরা মিষ্টান্ন দেয় না, মধ্যে মধ্যে কাঁচা মাছ তরকারি দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ জানিয়ে যায়। সীতারামের এই ভালবাসা এক বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। তার সাধ তার আকাঙ্ক্ষা ওদের ছেলেদের একজনকেও অন্তত সে লেখাপড়ার সত্যকার আস্বাদ দিয়ে, শিক্ষিত মানুষ ক'রে তুলবে।

সাহা-স্বর্ণকারদের ছেলেরা পড়ে, খানিকটা লেখাপড়া শিখতে হয়, না-শেখাটা লজ্জার কথা ব'লে শেখে। পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে বড় ইস্কুলে কয়েক ক্লাস কোনরকমে পার হয়ে, লেখাপড়া ছেড়ে নিজের নিজের ব্যবসায় লেগে যায়। কৈবর্তের ছেলেদের পড়া পাঠশালাতেই শেষ। নেহাৎ শখের ব্যাপার। পাঠশালার পড়াটাও শেষ করে না। বারো-তেরো বছর বয়স হ'লেই হাল গরু চাষ নিয়ে পড়ে, যারা জেলে-কৈবর্ত তারা জাল ঘাড়ে মাছ-ধরা ব্যবসায়ে লেগে যায়।

এই তো সেদিন, দুকড়ি জেলের ছেলেটা পাঠশালা ছেড়ে দিলে। ছেলেটা মন্দ ছিল না। আর এক বৎসর হ'লেই পাঠশালার পড়াটা শেষ হ'ত। হঠাৎ জাল ঘাড়ে ক'রে এসে প্রণাম ক'রে একটি মাছ দিয়ে দাঁড়াল নির্লজ্জ হাসিমুখে।

সীতারাম বললে, কি রে?

ছেলেটার বাপ দুকড়িও এসেছিল, সে বললে, পণ্ডিত মাশায়, আজ থেকে ছেলেকে জাত-ব্যবসা ধরালাম গো?

আর পড়বে না?

না। মাথা চুলকে দুকড়ি বললে, আমাদের ছেলে আর প'ড়ে কি করবে গো? ক'য়ের পেছুতে খ দিতে শিখেছে এই ঢের। জলকরের দলিলে সই দিতে পারবে, দেখে নিতে পারবে দলিল, এই ঢের। বাস্।

কৈবর্তদের লেখাপড়া শেখার সামান্য চেষ্টার পেছনে শখের সঙ্গে ওই একটা তাগিদ আছে। ভদ্রলোকদের কাছে ওরা পুকুর জমা নিয়ে থাকে। জমিদারের কাছে নেয় নদীর জলকর জমা। আগে কারবারটা চলত নিছক বিশ্বাসে। মৌখিক কথাবার্তা হ'ত, ওরা দিয়ে আসত খাজনার টাকা, এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারত, এক কুড়ি, দু কুড়ি, থাক সাজিয়ে টাকা দিয়ে জলকর-মালিকের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে আসত। কাল এখন পালটেছে। এখন আর মুখের কথায় বন্দোবস্তও হয় না, দলিল—'ডেমি' কাগজে দুখানা দলিল হয়, টাকা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। তাও প্রথম প্রথম ওরা টিপছাপ দিয়ে রসিদ নিয়ে চ'লে আসত সরল বিশ্বাসে, কিন্তু কাল যত এগুচ্ছে তত গোলমাল বাড়ছে, আজকাল দলিলে রসিদে গোলমাল বেরিয়ে পড়ছে। কয়েক ক্ষেত্রে ওদের টাকা জলে পড়েছে। তাই নাম সই আর দলিল পড়তে পারবার মত লেখাপড়াটুকু মাত্র ওরা শিখতে চায়, তার বেশি নয়। তাতে সীতারামের পাঠশালার খুব বেশি ক্ষতি হয় না। আর এক বছর পড়লে, সে এক বছরের মাইনেটা পেত, সেইটা পায় না এইটুকু মাত্র ক্ষতি। কিন্তু সীতারাম সে লাভ-ক্ষতি খতায় না। সে ওদের ভাল-বেসেছে, তাই সে চায়। ওদের একজনও সত্যকারের লেখাপড়া শিখুক, ক'য়ের পেছুতে খ দিতে শেখাটাই ঢের লেখাপড়া নয়, এই কথাটা সে ওদের বুঝাতে চায় অন্তত একজনকে শিক্ষিত ক'রে তুলে। সাঁওতালরা খ্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। শুনেছে, এইসব ছোটজাত ব'লে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্মেণ্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি

সে সেই রকম ক'রে তুলতে পারে, তবে তার আশা পরিপূর্ণ হয়। শিবকিঙ্কর বলেছিল সেই প্রথম দিন, চাষা, চাষা পণ্ডিত, শুঁড়ী ছাত্র, জেলে ছাত্র! হা হা ক'রে হেসেছিল। তার সেই ব্যঙ্গের, তার সেই হাসির উপযুক্ত জবাব হয় তা হ'লে।

রত্নপুরের সন্দীপন পাঠশালা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। নায়েবি তো সে করবেই না। নায়েবি! মানুষের উপর অত্যাচারের কাজ নায়েবি। মানুষকে ঠকানোর কাজ নায়েবি। নীচ কাজ। সে তা করবে না। রত্নহাট ছেড়ে গ্রামে পাঠশালাও ক'রে তার তৃপ্তি হবে না।

সকালবেলা যথানিয়মে সে রত্নহাট চলেছিল। হঠাৎ একটা কথা কানে এল পিছন থেকে, রত্নহাটের পণ্ডিত-রত্ন চলেছেন।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না সে, তবু গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলে, কথাটা বলেছে তারই বন্ধু চণ্ডী। চণ্ডী এখন গ্রামে ডাক্তার সেজে বসেছে। ওই রত্নহাটের ডাক্তারখানায় দিনকত কম্পাউণ্ডারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজ করছিল। সেখানে সুবিধে করতে না পেরে, গ্রামে এসে ডাক্তার সেজে বসেছে। তার কথা শুনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে সীতারাম। চণ্ডী রত্নহাটে ঠাঁই পায় নাই, তাই সীতারামের উপর ঈর্ষা,—সীতারাম ঠাঁই পেয়েছে।

অন্য একজন বললে, তা বাপু চালাচ্ছে তো গোঁজামিল দিয়ে।

চণ্ডী বললে, এইবার গোঁজা টেনে বার ক'রে ফেলেছে পুলিস সাহেব। আর পাঠশালা করতে হবে না।

সীতারাম একটু জোরে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল।

কোথায় পাঠশালা বসাবে সে?—এই চিন্তাটাই তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। বাবুদের কাছারির বারান্দা পেতে পারে সে। কিন্তু ওখানে পাঠশালা করতে কেমন তার মন চায় না। ওই উপপদ-তৎপুরুষ, ওই

মধ্যপদলোপী কানাই রায়, ট্যারা নায়েব দশ কথা বলবে, ঠাট্টা করবে, ছেলেদের ধমক দেবে, ছেলেরা গোলমাল করলে বিরক্ত হবে। ছেলেরাও ওখানে যেতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করে, ভয় পায়। ওদের হাজার উদারতা, অসীম অনুগ্রহ, ধীরাবাবুর বৈচিত্র্য, মায়ের মিষ্ট স্নেহ, সব সত্ত্বেও বাবুদের আপনার ভাবতে পারে না, তাদের উপর মনের বিরূপতাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না সে। তা ছাড়া রজনীবাবু তাকে ধীরাবাবুদের বাড়ির সংস্রব ছাড়তেই বলেছেন। তা অবশ্য সে ছাড়বে না, অকৃতজ্ঞ সে হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে ধীরাবাবুর বৈঠকখানাতেই পাঠশালা বসানো কোন ক্রমেই উচিত হবে না।

জায়গা সে কোথাও পাবে না। পুলিসের এই হাঙ্গামার পর ঘর ভাড়া তাকে কেউ দেবে না। তবে?

সে থমকে দাঁড়াল। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। দুঃখের হাসি! সঙ্গে সঙ্গে চোখে জলও এল। ভাবনার মধ্যে সে অন্যমনস্ক হয়ে বাবুদের বাড়ি না গিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পাঠশালা-বাড়ির দরজায়। দরজার মাথায় সাইনবোর্ডটা এখনও রয়েছে।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরল। আবার দাঁড়াল। রাস্তার এপাশে পাঠশালা-বাড়ির বিপরীত দিকে একটা অশ্বত্থগাছতলায় ছেলেরা খেলা করছে। ছায়াঘন গাছটার তলায় ঘাস গজায় না ছায়ার জন্য। তার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল শান্তিনিকেতন কথা। শান্তিনিকেতনে আমগাছের ছায়ায় ইস্কুল বসে। সে দেখেছে। সে শোভা অপরূপ!

মুহূর্তে তার মনের সকল অবসাদ কেটে গেল। এইখানে সে পাঠশালা বসাবে। বর্ষা আসতে দেরি আছে। বর্ষার সময় এইখানেই সে চালা তুলবে। সে জানে, এ জায়গাটা ধীরাবাবুর জাঠতুত দাদার। গাছটি তাঁর মায়ের প্রতিষ্ঠা করা গাছ। ধীরাবাবুর মাকে ব'লে এই গাছতলাটা সে খাজনায় বন্দোবস্ত ক'রে নেবে। প্রয়োজন হয়, শত

ক'রে নেবে—প্রতিষ্ঠা করা গাছে তার কোন অধিকার থাকবে না। গাছের তলাটি বাঁধিয়ে দেবার অঙ্গীকারও সে প্রয়োজন হ'লে করবে। পুরানো সন্দীপন পাঠশালার কাছেই সাহাপাড়া স্বর্ণকারপাড়া কৈবর্তপাড়া, যাদের ছেলেদের নিয়ে তার কারবার, তাদের মধ্যেই এইখানে এই গাছতলায় সে পাঠশালা আরম্ভ করবে।

দশ

অশ্বত্থতলায় পাঠশালা বসছে সীতারামের। ঘড়ি, ম্যাপ, বোর্ড এসব আসবাব আজও ঘরে বন্ধ আছে। গাছটার কাণ্ডতে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে—'রত্নহাট সন্দীপন পাঠশালা'।

পাঁচটি ছেলে নিয়ে গাছতলার পাঠশালা-পর্ব সে আরম্ভ করেছিল। এখন ছেলের সংখ্যা এগারোটি। সবচেয়ে তার বড় আনন্দ, এই ঘটনার পর দেবুকে তার পাঠশালাতে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন এ বাড়ির মা।

শিবকিঙ্কর মধ্যে মধ্যে রাস্তা দিয়ে যায়, দেখে। প্রথম যখন সে গাছতলায় পাঠশালা আরম্ভ করে, তখন একদিন সে এসে পথের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর হেসে আকুকে ডেকে বলেছিল, এই আকু!

কি?

হারাধনের দশটা ছেলে জানিস?

জানি।

বল্ দেখি, হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ-ভেউ—তারপর কি?

মনের দুঃখে বনে গেল রইল নাকো কেউ।

শিবকিঙ্কর হাসতে হাসতে চ'লে গিয়েছিল। কোন প্রতিবাদ করে নাই সীতারাম, চুপ ক'রে ব'সে ছিল। আজকাল ভাবে, শিবকিঙ্কর যখন

আসবে, তখন ছেলেদের হারাধনের দশটি ছেলে ফিরে আসার ছড়াটা আবৃত্তি করতে শিখিয়ে দেবে, কিন্তু সে ইচ্ছা আর হয় না। ছি!

মণিলালবাবু আর কথা বলেন না। সেও আর মণিবাবুকে নমস্কার করে না। সটান সোজা মাথায় সে চ'লে আসে।

দেবু পড়ছিল —

নেই কো মোদের কোঠা-বাড়ি
নেই কো মোদের বিত্ত,
গরব করি মোদের কভু
যায় নি ম'রে চিত্ত।
দিনমজুরি করছি নিয়ে
ক্লান্ত দেহখানি,
কুটির পানে যাই গো ধেয়ে
জেরটি দুখের টানি।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ। কি হ'ল তা হ'লে? কথাটা কে বলছে? বলছে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি, মানে—গরিব লোক, যার দালান কোঠা-বাড়ি নাই, যার বিত্ত অর্থাৎ প্রচুর ধনসম্পদ, মানে—মেলা টাকাকড়ি, সোনাদানা নাই, যে দিন-মজুরি ক'রে খায়, পায়ে জুতো নাই, গায়ে জামা নাই, দু বেলা পেট পুরে খেতে পায় না, এমনই একজন লোক বলছে, একজন গরিব লোক বলছে। বলছে—। কি বলছে, বল।

দেবু বললে, আমাদের কোঠা-বাড়ি নাই। আমাদের টাকাকড়িও নাই। তবুও আমাদের অহঙ্কার যে, আমাদের মন ম'রে যায় নাই।

সীতারাম বলে, মন মরে যায় নাই, কি রকম বল দেখি?

বিপদ কিন্তু আকুটাকে নিয়ে। একটা কিছু নিয়ে ফিসফাস আরম্ভ করেছে। সব ছেলেকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। সীতারাম আজকাল আকুকে আর কঠোরভাবে শাসন করতে পারে না। সে কিছুতেই

ভুলতে পারে না আকুর সে দিনের সেই কথাগুলি, তার সেই কাজগুলি।

ও না থাকলে হয়তো ঠিক এইভাবে এত শীঘ্র ভাঙা পাঠশালাটি আবার গ'ড়ে উঠত না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যাতে আকুর মন ভালর দিকে ফেরে, পড়াশুনায় মন বসে। কিন্তু কিছুতেই সম্ভবপর হচ্ছে না। সে দিন সে পড়াচ্ছিল, চাষা ব'লে একটি কবিতা—'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা'। জিজ্ঞাসা করেছিল, চাষা কাকে বলে ?

আকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, আপনারা স্যার্।

মাথাটা ঝনঝন ক'রে উঠেছিল রাগে। ইচ্ছা হয়েছিল, কঞ্চির ছড়ি দিয়ে ছেলেটার পিঠ রক্তাক্ত ক'রে দেয়। পূর্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে ক'রে অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করেছিল সে। তারপর তাকে বুঝিয়েছিল, যে লোক চাষ ক'রে খায়, নিজে হাতে চাষ করে, তারাই চাষা—চাষী। কৌশলে প্রসঙ্গক্রমে তাকে বলেছিল, তারা জাতিতে সদ্‌গোপ, সদ্‌গোপেরা চাষ ক'রে খায় ব'লে তাদের লোকে চাষা বলে।

আকু বলেছিল, গাঁয়ের লোক বলে কি, তোদের মাস্টার চাষা।

আকুর দোষ নাই। মণিলালবাবুর গ্রাম, শিবকিঙ্করের গ্রাম, ভদ্র সভ্য বাবুদের গ্রাম রত্নহাটের ভাষাই এই, ধারাই এই।

এক-একদিন বাইরে আত্মসম্বরণ ক'রেও এই আক্রোশকে দমন করতে পারে না। সেদিন সে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করতে পারে না। এ ব্যাপারটা ঘটে পাঠশালার শেষের দিকে। শরীরের অসুস্থ অবস্থাতেই ক্লান্ত হয়ে সে এক-একদিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হয়। সব ভুলে সে তখন নিষ্ঠুর কৌশলে নির্যাতন করে ছাত্রদের। কানের জুলপির চুল ধ'রে নির্মমভাবে টানে, দুটো আঙলের মধ্যে একটা পেন্সিল পুরে দিয়ে সজোরে চাপ দিতে থাকে, পেটের মাংস ধ'রে টানে, অবশেষে সামনের চুলের মুঠো চেপে টেনে ঘাড় নুইয়ে দিয়ে বার কতক ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দেয়।

দিন যায়, ছেলেরা পড়ে, সীতারাম পড়িয়ে যায়।

একদিন পাঠশালার সামনেই রজনীবাবুর সঙ্গে সীতারামের দেখা। সীতারাম দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলে তাঁকে। রজনীবাবু বললেন, আমি চ'লে যাচ্ছি সীতারাম।

চ'লে যাচ্ছেন? ট্রান্‌সফার হচ্ছেন?

হঁ্যা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রজনীবাবু বললেন, আমার দুঃখ থেকে গেল, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলাম না। যাই হোক, নোট আমি উপরে দিয়েছি। এখানেও রেখে গেলাম। যিনি আসছেন, তিনি লোক ভাল। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো। আমার বিশ্বাস, তিনি ক'রে দেবেন তোমার কাজ। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, আর একটি কথা তোমাকে ব'লে যাই। দেশের নতুন স্বায়ত্তশাসন আইনের কথা জান তো? এই যে কিছুদিন আগে আইনসভার ভোট হয়ে গেল?

সীতারাম ম্লান হেসে বললে, জানি। ম্লান হাসি হাসলে, তার কারণ কংগ্রেস-আন্দোলন, ধীরাবাবুর জেল—সবই তো সেই ব্যাপার নিয়ে। ভুয়ো স্বায়ত্তশাসন। কাগজে লেখে, 'মণ্টেগু মাকাল'।

রজনীবাবু বললেন, সেই আইন, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড আর ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে থাকবে না। নতুন ইলেকশন হয়ে নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হবে। আমাদের এখানে রায়সাহেব মুখুজ্জে দাঁড়াচ্ছেন, আরও দাঁড়াচ্ছেন সব। তুমি এক কাজ ক'রো। রায়সাহেবের ভোটে খেটে দিও। তা হ'লে উনি চেয়ারম্যান হ'লে তখন তোমার এড সহজেই হবে। এড তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতে।

সীতারাম আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হ'ল রজনীবাবুর ট্রান্‌সফারের সংবাদে। সত্যই এমন ভাল লোক বুঝি আর হবে না। কোমল চিত্ত, ধার্মিক মানুষটি, কখনও কাউকে রূঢ় কথা বলেন নাই। সীতারাম কোন

কথা না ব'লে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, শুধু চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা। রজনীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, তোমার ভাল হবে সীতারাম। শিক্ষকতা তুমি ছেড়ো না।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। চ'লে গেলেন। সীতারাম দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

এক মাসে আর দুটি ছেলে বেড়েছে তার পাঠশালায়। তেরোটি ছেলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তেরোটি ছেলের একটিও তেমন ভাল ছেলে নয় কেউ। এক শো ছেলের বদলে যদি একটি ভাল ছেলে—সত্যকার ভাল ছেলে সে পায়, তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করে। ভরসা ছিল তার দেবুর উপর। কিন্তু সে ভরসা তার দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। দেবু ক্রমশই বেশি চঞ্চল এবং পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছে। জ্যোতিষের ভাইপোটি কেমন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এক-এক সময় নিজের উপর সন্দেহ হয়। এ কি তার নিজের অকৃতিত্ব? নিজের ক্ষমতার অভাব। তার জন্যই কি ওদের ওই রকম পরিণতি হচ্ছে?

সে এবার প্রাণপণে লাগল।

আকুর কিছু হবে না। ওকে পাঠশালা থেকে বিদায় করা উচিত। কিন্তু বিদায় ও নেবে না। পাঁচ রকম বদ বুদ্ধি জেগেছে ওর মনে। এবার ওকে প্রাইমারি পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে বিদায় করবে সে। আবার ধুয়ো তুলেছে আকু, পাঠশালার ফুটবল টীম করতে হবে। তার অবশ্য কথাটা ভাল লেগেছে, ইচ্ছাও অনেক দিনের। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এসব নাই। সেখানে পণ্ডিতেরা ছুটি দিয়েই খালাস। কিন্তু রত্নহাটের মত জায়গায় তো খালাস নিলে চলবে না। এখানে বড় ইস্কুলের

সংলগ্ন পাঠশালায় ছেলেদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের কাছে সেটা একটা বড় আকর্ষণ। তা ছাড়া তার পাঠশালার ছেলেরা মুখ চুন ক'রে ওদের ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ডের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সে তার সহ্য হয় না। সুতরাং তার পাঠশালাতেও এটা রাখতে হবে।

আর সে দ্বিধা না ক'রে ফুটবলের অর্ডার দিয়ে চিঠি লিখে আকুর হাতে দিয়ে বললে, যা, ফেলে দিয়ে আয়।

আকু লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল, 'সন্দীপন পাঠশালা ফুটবল টীম'। চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ—হাই ইস্কুলের প্রাইমারি সেক্‌শন ফুটবল টীমের সঙ্গে।

ছেলেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দে।

পড়। পড়। সব পড়। দেবু, সাহা, অঙ্ক নাও। এক মণ সন্দেশের দাম যদি চল্লিশ টাকা দশ আনা ছয় পাই হয়, তবে ওই দরে পাঁচ মণ সন্দেশ কিনিয়া কত টাকা সের দরে বিক্রয় করিলে এক শত পঁচিশ টাকা লাভ হইবে? গণেশ, গোকুল, তোমাদের পড়া নিয়ে এস। বই বন্ধ ক'রে মহাত্মা হাজী মহম্মদ মহসীনের গল্প বল।

স্তব্ধ দুপুর। ছেলেরা মৃদুস্বরে পড়ছে, মধুচক্রের মধুপানরত মধু-মক্ষিকাদের গুঞ্জনধ্বনির মত গুঞ্জন উঠছে। পড়, পড়। বিদ্যাই হ'ল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধু। আকণ্ঠ পান কর সব। জীবন ধন্য কর। দেবু এবং সাহার শ্লেটের উপর পেন্সিল পড়ছে, টুক-টুক শব্দ উঠছে। গণেশ বলছে, মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থস্থল মক্কা। এই মক্কা তীর্থে যে সকল মুসলমান হজ করিয়া আসেন, তাঁহাদিগকে হাজী বলে। মহম্মদ মহসীন মক্কা তীর্থে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হাজী বলা হয়।

বাঃ, বাঃ! ব'লে যাও। পড়, পড়, তোমরা পড়। প্রাণ দিয়ে পড়। মন দিয়ে পড়। প্রাইমারি পাস কর। আমার কাছে যতটুকু আছে নাও, তার সবটুকু তোমরা নাও। আদায় ক'রে নাও। নিতে কষ্ট হ'লে বল। তারপর যাও বড় ইস্কুলে। সেখান থেকে যাও

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। মঙ্গল হোক তোমাদের, উন্নতি হোক তোমাদের, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হও, দেশের মঙ্গল কর, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সন্দীপন পাঠশালা ধন্য হবে। সীতারাম পণ্ডিত, সামান্য ব্যক্তি, চাষী সদ্‌গোপের ছেলে, তার নাম তোমাদের কীর্তির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে, সে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাড়ে তিনটার ট্রেনের বাঁশী বাজে।

স্যার্, সাড়ে তিনটে বাজল।

হ্যাঁ। নামতা প'ড়ে নাও। পড়াও, আজ দেবু পড়াও।

দেবু দাঁড়াল একা। ছেলেরা দপ্তর বেঁধে বসল। দেবু বলতে আরম্ভ করলে, একে—চন্দ্র।

সমস্বরে ছেলেরা বললে, একে—চন্দ্র।

দুয়ে—পক্ষ।

দুয়ে—পক্ষ। ক্রমে ক্রমে আশী নব্বুই পার হয়ে যায়, আসে নয়দশ—নব্বুই। দশ-দশে—দশে শূন্য, এক শো।

এইবার কড়া। এক কড়া—পোয়া গণ্ডা।

সুর উঠতে থাকে। ক্লান্ত শরীরে সীতারামের এ সুর বেশ লাগে। ঘুমের মত ঝিমুনি আসে।

নামতা-পড়া শেষ হ'ল। এ অঞ্চলে বলে নামতা ঘোষা—অর্থাৎ ঘোষণা ক'রে পড়া। এইবার ছুটি।

ছোট দুটি ছেলে এসে দাঁড়াল, কাল ষষ্ঠী স্যার। কাল ছুটি।

মায়ের ছোট ছেলে বুঝি? আচ্ছা, এক বেলা ছুটি। টিফিনের পর আসবে। পাঠশালায় ছোট ছেলেদের ছুটির ফর্দ বেশি। ষষ্ঠীপূজোয় এক বেলা ছুটি। নবান্নে ছুটি। লক্ষ্মীপূজোতে ছুটি। আহা, শিশুর দল! আনন্দ তো ওদেরই।

ছুটির পর ছেলেরা বল নিয়ে যায় স্টেশনের ধারে মাঠে। সীতারাম

ব'সে থাকে। নিজে বাঁশী বাজায়। খেলা শেষ হ'লে বলটি নিয়ে ফিরে আসে।

সন্ধ্যার পর শ্যামু আজকাল অন্য একজন মাস্টারের কাছে ইংরেজী পড়তে যায়। কানাই রায় লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে যায়। দেবু একা পড়ে এখন। খেলতে গিয়ে দেবুর পা মচকে গিয়েছে আজ। সে এল না পড়তে।

সীতারাম বেরিয়ে পড়ল। একটু মাঠের ধারে গিয়ে বসবে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্না ভরা মাঠে ব'সে ব'সে ভাববে, নিজের অদৃষ্টের কথা, দুঃখের কথা। দুঃখের কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। দুঃখ পেলে যেন সে ভাল থাকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে যেন তৃপ্তি পায়।

এগারো

দিন যায়। মাস যায়। বৎসর যায়। পাঠশালা চলে। একদল যায় পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে। নতুন দল আসে প্রথম ভাগ হাতে—শ্লেট বগলে।

মাস্টার ব'সে রিপু করছিল।

ছেলেরা ব'সে পড়ছে। নতুন ছেলের দল। দেবু, জ্যোতিষ সাহার ভাইপো এবং তার সহপাঠীরা চ'লে গিয়েছে এখানকার পড়া শেষ ক'রে। আকু বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়েছে। সে কিন্তু কয়েকজন শিষ্য রেখে গিয়েছে—দুষ্টুমি করে, এক ক্লাসে দু বছর তিন বছর থাকে, মিথ্যা কথাও বলে। আকুর শিষ্য ঠিক বলা যায় না। সীতারাম অনেক ভেবে দেখে ঠিক করেছে, ওরা হ'ল প্রথম ভাগের রাখাল নামক দুষ্ট ছেলেটির শিষ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম তাকে পাঠশালায় ভর্তি ক'রে ওদের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। ওরা থাকবেই।

নতুন কচি কচি মুখ সব।

সীতারামের সবচেয়ে বড় আনন্দ, এবার সে সত্যকার একটি ভাল ছেলে পেয়েছে। বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে সে। হঠাৎ তাকে সীতারাম আবিষ্কার করেছে। ফুটফুটে ছেলেটি, ঝকমকে চোখ, তার মুখের দিকে চাইলেই সীতারামের বুকটা ফুলে ওঠে। সময় সময় মনে হয়, তার ভাগ্যটা এখন ভাল চলছে। দীর্ঘ দিনের পর একখানা চালা-ঘর সে তৈরি করিয়েছে। আটচালার মত শুধু একটা ছাউনি। ব্ল্যাক-বোর্ডখানা এনে লাগানো হয়েছে। ঘড়ি ম্যাপ এগুলি এখনও টাঙাতে সাহস হয় না। চারিদিক খোলা, যদি কেউ নিয়ে যায় বা ভেঙে দিয়ে যায়! শিবকিঙ্করের দল এখনও আছে। তাদের অবশ্য আক্রোশ আর পূর্বের মত নাই, দীর্ঘ দিনে তারা হীনবল না হ'লেও, ক্রমশ যেন তাদের এই উৎসাহটি শিথিল হয়ে পড়েছে। মণিবাবুর দীপ্তিও যেন ম্লান হয়ে এসেছে।

সীতারাম স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু মণিবাবু নয় এই রত্নহাটের বাবুদেরই যেন সমস্ত বস্তিরঙ্গটার চেহারা ক্রমশ ময়লা কাপড়-জামার মত হয়ে আসছে। প্রণাম গান্ধী মহারাজ, প্রণাম দেশবন্ধু, প্রণাম যতীন্দ্রমোহন, প্রণাম সুভাষচন্দ্র! সঙ্গে সঙ্গে ধীরানন্দকেও সে প্রণাম করে। তোমাকেও প্রণাম! তুমিই তো এখানকার মান রেখেছ। এই স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে বাবুদের চেহারায় যেন কালের ছাপ পড়েছে। জমিদারদের, মহাজনদের সায়েব-সুবো-ঘেঁষা যারা, তারা যেন আগেকার আমলের শুভঙ্করী অঙ্করীতির মত পাঠ্যপুস্তক হতে বাদ যেতে বসেছে। তিন পাইয়ে এক পয়সার চলন হওয়ায় কড়া-গণ্ডার হিসেবের মত মান হারিয়েছে। হাল আমলে সহজ চলতি কথায় বই

লেখার চলন হওয়ায় সে আমলের বিদ্যাসাগরী বড় বড় কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে লেখা বইয়ের মত অচলিত হয়ে যেতে বসছে বাবুরা। সীতারাম বেশ জানে যে, এ গ্রামের প্রধান জন এর পর হবে এই ধীরানন্দ। সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নাই। দীর্ঘজীবী হোক ধীরাবাবু। তাতে তার পরম আনন্দ। ধীরাবাবুরা তাদের জমিদার ব'লে আনন্দ নয়, ধীরাবাবু তাকে প্রীতির চোখে দেখেছিল, সে তাকে ভালবাসে, তাই তার আনন্দ। আঃ, ধীরাবাবু যদি তার বন্ধু না হয়ে তার ছাত্র হ'ত, তবে তার আনন্দ হ'ত সবচেয়ে বেশি।

ধীরাবাবু কবে আসবে—সেই পথ চেয়ে আছে সে। তার উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু তারও মধ্যে এড না-পাওয়ার দুঃখ অহরহ তাকে কষ্ট দেয়। রজনীবাবু বলেছিলেন, ভোটে রায় সাহেবকে সাহায্য করতে। সে তা করেছিল। কিন্তু তবু তার এড হয় নাই। হাজার হ'লেও রায় সাহেব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেবকে চটিয়ে তিনি কিছুই করতে সাহস করেন না। ধীরাবাবু এলে, তাঁকে নিয়ে সে একবার এর জন্য লড়বে। ধীরাবাবু ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

ভাবতে ভাবতে উদাস স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে সীতারাম। হঠাৎ একসময় কানে আসে, ছেলেরা গোলমাল করছে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে নিজেকে সংযত ক'রে সজাগ হয়ে বসে, বলে, এই! এই! চুপ! পড়, পড় সব।

সাধারণ ছেলেরা এক ধমকেই চুপ করে। চুপ করে না বাবুদের ছেলেরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে সামনে এনে হাজির করে তাদের অভিযোগ।

ও স্যার্, আমাকে মারলে। ঘুষি মেরেছে।

ও আমাকে উল্লুক বলেছে স্যার্।

সীতারামের ইচ্ছা হয় ওদের দুর্দান্তভাবে প্রহার করতে। তার দুর্ভাগ্য, বাবুদের যত দুষ্ট ছেলেগুলি হাই স্কুলের পাঠশালার উচ্ছিষ্টের মত তার পাঠশালায় এসে জমে। তার ইচ্ছা হয়, চীৎকার ক'রে বলে, ওরে, তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে, সিন্দুকে টাকা আছে। মান ইজ্জত দালান কোঠার ইটে ইটে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে দরকার কি? কেন গরিবের ছেলেদের পড়ায় ব্যাঘাত করিস?

এখন পাঠশালায় ছেলে হয়েছে বাইশটি। আরও বাড়াবে সে জানে। কৈবর্তদের মধ্যে, সাহা-স্বর্ণকারদের মধ্যে লেখাপড়ার ঝোঁক চেপেছে।

কখনও কখনও তার এই উদাসীনতা ভেঙে দেয় জয়ধর নামে ভাল ছেলেটি।

মাস্টার মশাই!

অ্যাঁ।

এইখানটা দেখুন।

সাদরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে সীতারাম হেসে বলে, কোন্‌খানটা বৎস?

এই যে।

সীতারাম তাকে বলে, ব'স এইখানে ব'স। তারপর সে তাকে বুঝাতে আরম্ভ করে।

কোনদিন সে আসে, মাস্টার মশাই, এই অঙ্কটা উত্তরের সঙ্গে মিলছে না।

সীতারাম ভাল ক'রে দেখে জয়ধরের কষা অঙ্ক। কোনখানে ভুল নাই। নিজে ক'ষে দেখে একবার। জয়ধরের উত্তরের সঙ্গেই মিলে যায়। সে বলে, উত্তর ভুল আছে। কেটে তোমার উত্তর বসিয়ে দাও। প্রাণ খুলে অকারণে সে হাসে। সবচেয়ে তার বড় আনন্দ, জয়ধর নিতান্ত গরিব ছেলে, বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে।

ছেলেটা এসে ব'সে থাকত দেবুর পড়ার ঘরের সামনে। ব'সে ব'সে শুনত এক মনে। নিজের একখানা জীর্ণ দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে ব'সে থাকত, পড়ত। অন্য যে কোন বই পেলে পড়তে চেষ্টা করত। কয়েক দিনের মধ্যেই সীতারাম বুঝতে পারলে তার অসাধারণত্ব। দেবু পড়ছিল মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারত-তীর্থ" কবিতা। বড় ইস্কুলে প্রাইজ হবে, দেবু আবৃত্তি করবে কবিতাটি। পড়ানো শেষ ক'রে স্নান-খাওয়া সেরে পাঠশালা যাচ্ছিল সে, হঠাৎ তার কনে এসে ঢুকল জয়ধর আপন মনে ব'লে যাচ্ছে—

"ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কি ক'রে শিখলি রে, জয়ধর। সে প্রশ্ন করেছিল।

ঝকমকে চোখ তুলে জয়ধর বলেছিল, বাবু পড়ছিল যে।

তাই শুনে তুই শিখলি ?

হ্যাঁ সবটা পারি নাই, খানিক শিখলাম।

বল তো, কতটা শিখেছ।

জয়ধর অনেকটা আবৃত্তি ক'রে গেল। "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার"— পর্যন্ত ব'লে হেসে বললে, আর পারি নাই।

সীতারাম উৎসাহিত হয়ে ব'লে গেল—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

জয়ধর তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে গেল। সীতারাম তার হাত ধ'রে বললে, চল্, আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়বি। অদ্ভুত ছেলে! শ্রুতিধর

ব'লে মনে হ'ল সীতারামের। সেই তাকে বই কিনে দিলে, জামা-কাপড়ও কিনে দিয়ে তাকে ভর্তি ক'রে নিলে পাঠশালায়।

জয়ধর ছোট থেকে বড় হবে। সামান্য জয়ধর অসামান্য অসাধারণ হয়ে উঠবে এই তার বড় আনন্দ। সে এই বাবুদের ছেলে হ'লে এত আনন্দ তার হ'ত না। মধ্যে মধ্যে তার চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়, ওরে, ওরে, তোরা বাবুদের ছেলেরা, তোরা দেখ্। তোরা দেখ্।

জয়ধর যে বৃত্তি পাবে, তাতে তার সন্দেহ নাই। জয়ধর পড়ে, নির্ভুল উত্তর দেয়, অসামান্য তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচয় ফুটে ওঠে তার পড়াশুনার মধ্যে। আনন্দে সীতারামের বুক দশহাত হয়ে ওঠে। মধ্যে মধ্যে দেবুর পড়াশুনায় অমনোযোগ লক্ষ্য ক'রে তার দুঃখের বদলে আনন্দ হয়। একদিন এই বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর, এ বাড়ির অন্যতম উত্তরাধিকারীকে ম্লান ক'রে দিয়ে ফুটে উঠবে। পরক্ষণেই সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়। না, এমন কামনা করা তার উচিত নয়। সে কামনা না করলেও, অবশ্য তাই হবে সে জানে, তবু কল্পনায় আনন্দ অনুভব করা তার পক্ষে অন্যায় হবে। এ বাড়ির কাছে তার ঋণ অনেক।

মরেছে রে মরেছে! একটা ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কি হ'ল? ওরে, এই রাধাশ্যাম, কি হ'ল? কে মারলে?

রাধাশ্যাম কৈবর্তদের ছেলে। নাক দিয়ে দরদর ধারে রক্ত পড়ছে। এক দণ্ড শান্তি যদি আছে অদৃষ্টে! কে মারলে?

কেউ না স্যার্। যে ছেলেটি শুশ্রূষা করছিল রাধাশ্যামের, সে বললে নাকে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়েছে স্যার্।

পেন্সিল?

হ্যাঁ। এতবড় স্লেট-পেন্সিল নাকে ঢুকিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

কি বিপদ! সীতারাম ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে মনে হ'ল। কিন্তু উপায় করলে

শুশ্রূষাকারী ছেলেটি। বললে, নস্যি দিয়ে দেন স্যার্, হাঁচলেই বেরিয়ে যাবে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল সীতারামের। সে তাকে পাঠালে নস্যি কিনতে।

ছেলেটি নস্যি নিয়ে ফিরে এসে বললে, সাবনিস্‌পেক্টার আসছেন স্যার্।

সাব-ইন্সপেক্টর! তার জন্য সীতারাম ব্যস্ত হ'ল না। এড্ই পায় না। তার পাঠশালাকে মঞ্জুরই দেয় নাই আজও পর্যন্ত। সাব-ইন্সপেক্টরের জন্য ব্যস্ত হওয়ার তার তাগিদও নাই। তার চেয়েও তাগিদ, রাধাশ্যামের নাকে রক্ত পড়ছে। নাকে নস্য দিয়ে দিলে সীতারাম।

বাইরে বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেটা ফ্যাঁচ ক'রে হেঁচে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল পেন্সিলটা। বাইসিক্লের ঘণ্টাটা আবার বাজল। সাব-ইন্সপেক্টরবাবু বাইরে থেকেই ডাকছেন, পণ্ডিত! সীতারাম!

সাব-ইন্সপেক্টর ভাল খবর নিয়ে এসেছেন। নতুন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ইলেক্‌শন হয়েছে আবার কিছুদিন আগে। ইলেক্‌শনের ফল বেরিয়েছে। এবার রায় সাহেবের দল হেরে গিয়েছে। কংগ্রেস জিতেছে প্রায় সব থানাতেই। সাব-ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, এইবার তোমার উপায় হবে সীতারাম।

উপায় হবে? সীতারাম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

হবে বই কি পণ্ডিত। এই নতুন বোর্ড হবার অপেক্ষা।

সীতারাম প্রণাম করলে সাব-ইন্সপেক্টরবাবুকে।

সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, পণ্ডিত, আমরা সরকারী চাকরি করি, চাকরির দায়ে আমরা নিজেকে বেচেছি। দেশের হয়ে কথা বলবার

উপায় নাই। তোমার উপর যে সব কাণ্ড হয়েছে সামান্য অপরাধে, তাতে দুঃখই পেয়েছি মনে মনে, কিন্তু করতে তো কিছু পারি নাই: রজনীবাবু বার বার ক'রে তোমার কথা ব'লে গিয়েছিলেন আমাকে। তা এইবার হবে। বোর্ড ফর্ম হ'লে—। চেয়ারম্যানের কানে একবার তুলতে পারলে হয়। তোমার ইস্কুলের ছাত্ররা বলেছে, মহাত্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। চেয়ারম্যান ডবল গ্র্যাণ্ট দেবেন তোমার পাঠশালায়। আমি চেষ্টা করছি ব্যাপারটা তাঁর কানে তুলতে।

প্রবীণ ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টরবাবুটি লোক ভাল। রজনীবাবুর মতই ভাল লোক। ভদ্রলোক রুগ্ন ব'লে মধ্যে মধ্যে অকারণে চ'টে উঠেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যান। এক হিসেবে রজনীবাবুর চেয়ে ভাল, অন্তত পণ্ডিতদের পক্ষে ভাল। পণ্ডিতদের হয়ে তিনি উপরের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন।

সীতারাম আজ শুধু খুশিই হ'ল না, সে নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করলে সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর কাছে। পরের দিনই সকালে সে সাব-ইন্সপেক্টর-বাবুর বাসায় উপস্থিত হ'ল বড় একটি ওল হাতে নিয়ে। সকৃতজ্ঞভাবে নামিয়ে নিয়ে বললে, আমার বাড়িতে হয়েছিল সার্।

সাব-ইন্সপেক্টরবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন, চমৎকার, চমৎকার ওল! চমৎকার! সাব-ইন্সপেক্টরবাবু নিত্য ওলসিদ্ধ খান। যেখানেই যান খোঁজ করেন, পণ্ডিত, তোমাদের এখানে ভাল ওল পাওয়া যায়? ভাল ওল?

সাব-ইন্সপেক্টর ওলটি দেখে বললেন, ব'স সীতারাম, ফাইলটাই তোমাকে দেখাই। দেখ, আমি কত লিখেছি তোমার জন্যে। হয়ে যাবে, আমি বলছি, হয়ে যাবে তোমার।

সীতারাম আশান্বিত হয়ে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে সেই দিনের।

সেইটাই হবে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আশান্বিত দৃষ্টিতে সে ছেলেদের দিকে চায়।

কচি কচি মুখ নিয়ে ব'সে পড়ছে তারা। আসুক সে দিন, ঘর তুলবে সে পাঠশালার জন্য। পাকা মেঝে। বেঞ্চ ব্যবস্থা করতে হবে ওদের জন্য। চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ক্লক-ঘড়ি, ম্যাপ, গ্লোব, চক-পেন্সিল, ডাস্টার কত আসবাব করতে হবে!

বৈকালে সে ঝরনার ধারে গিয়ে অভ্যাসমত বসল। আজ সে কল্পনাকে খাঁচার দোর খুলে পাখির মত উড়িয়ে দিলে। এড পাবে সে এইবার। তার সাধ পূর্ণ হবে। সে যেন পণ্ডিতদের সামনে এতদিন একঘরে হয়ে ছিল। এইবার সে জাতে উঠবে! ঘাট মেনে, অপরাধ স্বীকার ক'রে জাতে ওঠা নয়। নিজের জেদ বজায় রেখে সে জাতে উঠবে। ভবিষ্যতের পাঠশালার জমজমাট চেহারা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"সন্দীপন পাঠশালা। রত্নহাট। শিক্ষক—শ্রীসীতারাম পাল।" বর্ষায় রৌদ্রে লেখা ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে আসবে। বৎসর বৎসর তার উপর সে কালি দিয়ে নূতন ক'রে লিখবে। তার চুল সাদা হয়ে আসবে, দৃষ্টি ক'মে আসবে, চশমা নিয়ে সে পড়াবে। ছেলেরা ব'সে পড়বে। কচি কচি মুখ। একদল যাবে আর একদল আসবে। তাদের পড়ানো শেষ করিয়ে আশীর্বাদ করবে, আমার তো দুঃখেরই জীবন, দুঃখ-কষ্টের ভাগ্য নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি। তোমরা কিন্তু উন্নতি কর, সুখী হও। সেই দেখেই সবচেয়ে বড় সুখ পাব আমি।

সংসারের কষ্ট তার সত্যই কিছু বেড়েছে। কিছু বেড়েই ক্ষান্ত নাই, দিন দিন বাড়ছে। বাপের শ্রাদ্ধের সময় কিছু ঋণ করেছিল, ভেবেছিল, পাঠশালার আয়টাকেই সে মাসে মাসে দিয়ে যাবে। তাতে অন্তত সুদটা

মিটে থাকবে। কিন্তু তাও হয় নাই। পাঠশালার আয়ই বা কি ছিল তার এতদিন। অন্যদিকে ধানের দর নেমে যাচ্ছে দিন দিন। স্বল্প-সল্প জমির আয় আরও কমছে। এডটা পেলে এবার কিছু সুবিধা হবে। মাসে পাঁচ টাকা আয় বৃদ্ধি তো তার মত লোকের পক্ষে কম নয়।

পরক্ষণেই তার হাসি পেল। পাঁচ টাকা! হায় রে! দুনিয়া পালটাচ্ছে দিন দিন। বাজারের পথে যেতে গেলে নিত্য নতুন জিনিস চোখে পড়ে। মন যেন কাঙাল হয়ে ওঠে। পাঁচ টাকা আয় বাড়লে, তার একটা কণাও কি সে পেতে পারবে? মধ্যে মধ্যে কত জিনিস কিনতে সাধ হয়। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নিজের মনকে শাসন করে, তুমি পাঠশালার পণ্ডিত, তুমি ওদিকে তাকিও না। "ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে" জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবনাটা তার সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। সে ভাবে ভবিষ্যতের কথা।

মনে প'ড়ে যায়, রজনীবাবুর আপিসে কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলো। বৃদ্ধ পণ্ডিত টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন তারই সমবয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে। কন্যাটি বিধবা হয়েছে। তার সব ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এখন কোথায় বাবুদের বাড়িতে ভাত রান্না করে। বুড়ো পণ্ডিতের নিজের অবস্থাই এখন শোচনীয়। তার পণ্ডিতি করার সামর্থ্য গিয়েছে, সে এখন ভিক্ষা করে। গ্রামে গ্রামে ফেরে, অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে দু দিন এক দিন থাকে, স্তব-স্তুতি ক'রে দু আনা চার আনা নিয়ে পনেরো বিশ দিন অন্তর বাড়ি যায়।

সে শিউরে ওঠে। তারও কি শেষ পর্যন্ত এমনই দশা হবে? একমাত্র সান্ত্বনা, তার কিছু জমি আছে। আর সান্ত্বনা, তার সন্তান ওই একটি মাত্র কন্যা। তার বড় সাধ ছিল একটি পুত্র-সন্তানের। তাকে সে নিজের মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলত। কিন্তু দরিদ্র শিক্ষক সে, কোন্ সম্বল থেকে তাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে গড়ে তুলবে?

কল্পনা-চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ তার মন সচেতন হয়ে ওঠে। কোনদিন মাথার উপর দিয়ে প্যাঁচা ডেকে যায়, কোনদিন মাথার উপর বাদুড়ের পাখার শব্দ বেজে ওঠে, কোনদিন কাছেই ডেকে ওঠে শেয়াল। সে সচেতন হয়ে উঠে আকাশের দিকে তাকায়। অন্ধকার আকাশ, কষ্টিপাথরের মত কালো আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। চাদনী রাত্রে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে চারিদিক। মাটির উপরে তার ছায়া পড়েছে দেখা যায়।

বারো

আরও বৎসর দুয়েক পর।

সীতারামের মনে হ'ল, পৃথিবীতে তার চেয়ে সুখী আর বোধ হয় কেউ নাই। মনে হ'ল, এই দিনটির জন্যই বোধ হয় সে আজন্ম তপস্যা ক'রে ছিল।

মণিলালবাবু এলেন তার পাঠশালায়।

পাঠশালা তখন মঞ্জুরি পেয়েছে, গ্র্যাণ্ট পেয়েছে। পাঠশালার বাড়িও হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজে এসেছিলেন তার পাঠশালায়। ধীরাবাবু দীর্ঘজীবী হোন। ধীরাবাবু নিয়ে এসেছিলেন।

ধীরাবাবু, সেই ধীরাবাবু।

সীতারামকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন, পণ্ডিত, আই লাভ ইউ।

ধীরাবাবু তাকে ভালবাসে শুনে সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। কত কথা বলছিল, তার নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা। তারপর সে ধীরাবাবুকে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

আমি কলকাতায় থাকি। ছোট একটা মেসে থাকি এখন। আগে একটা টিনের ঘরে থাকতাম, পাইস-হোটেলে খেতাম।

টিনের ঘরে থাকতেন? পাইস-হোটেলে খেতেন?

হ্যাঁ! তখন রোজগার যেমন তেমনই থাকতে হবে তো! জান তো, লিখে উপার্জন আমাদের দেশে কত কঠিন!

ধীরাবাবু লেখক হবেন। বই লিখে তিনি জীবিকা অর্জন করতে চান। আশ্চর্য মানুষ! ধীরাবাবু তাঁর কখানা বই তাকে দিয়ে গিয়েছেন। সে পড়েছে। বেশ লিখেছেন, চমৎকার লিখেছেন ধীরাবাবু!

বই কখানা হাতে পেয়ে সেদিন তার লজ্জার অবধি ছিল না। ধীরাবাবুর সেই বই কখানা আজও তার বাড়িতে রয়েছে। একবার মনে হয়েছিল, ধীরাবাবুর দুটি হাতে ধ'রে সে সে-কথা প্রকাশ করে তাঁর কাছে। কিন্তু সেও সে পারে নাই। সেই সমস্ত বইয়ের একখানার খোঁজও করেছিলেন ধীরাবাবু—বইখানা যেন কিনেছিলাম মনে হচ্ছে।

সীতারাম বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, অনেক চেষ্টা ক'রে বলতে চেয়েছিল, আমি একবার দেখব আমার বাড়িটা খুঁজে। কিন্তু সে দুবার শুধু বলেছিল, আমি, আমি—

ধীরাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, দেবা, না হয় শ্যামা কোনখানে দিয়ে থাকবে আর কি!

ধীরাবাবু নিয়ে এলেন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। পনেরো-কুড়ি টাকা খরচ ক'রে বই আনলেন সন্দীপন পাঠশালার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউ-শনের জন্য। নিজে গিয়ে চেয়ারম্যানকে নিয়ে এলেন।

সীতারাম পাঠশালার রিপোর্ট লিখেছিল। ধীরাবাবু দেখে দিলেন। কম্পিতকণ্ঠে সে রিপোর্ট পড়লে। সন্দীপন নামের ইতিহাস পৌরাণিক। সীতারাম লিখেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু। ধীরাবাবু কেটে করেছিলেন

"মহামানব শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সন্দীপন মুনির নামে এই পাঠশালার নামকরণ হইয়াছে।"

গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই সেদিন এসেছিলেন। বড় ইস্কুলের মাস্টারেরাও উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন, যে পাঠশালার ছাত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে অহিংসা ও সত্যের প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর নাম করতে পারে, সে পাঠশালাকে আমি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করি।

চেয়ারম্যান মাসে ছ টাকা এড মঞ্জুর ক'রে দিয়েছেন। পাঠশালার বাড়ির জন্য এককালীন একশো টাকা দান দিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড থেকে। আসবাবের জন্য ত্রিশ টাকা।

ঘর হয়েছে। আসবাবও কিছু হয়েছে। কিন্তু আরও চাই। সেও বোধ হয় হবে। গ্রামের লোক প্রসন্ন হয়েছে। চেয়ারম্যানের প্রশংসা পেয়েছে সে, তার উপর এবার জয়ধর তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সমগ্র জেলার মধ্যে সে বৃত্তি-পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।

এবারও একটি ভাল ছেলে আছে—নরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে। সেও বৃত্তি পাবে। এটি বাবুদের ছেলে। কিন্তু সীতারামের এতেও খুব আনন্দ এই কারণে যে, এই ছেলেটিকে বড় ইস্কুলের পাঠশালা এক রকম বর্জন করেছিল অপদার্থ হিসেবে। অপদার্থই ছিল। দুর্দান্ত ছেলে। কিন্তু ভারি সুন্দর চেহারা! সীতারামের মমতা হয়েছিল ব'লেই সে তাকে নিয়েছিল। তারপর সে আবিষ্কার করলে, মিষ্ট কথা বললে ছেলেটি বড় ভাল। আরও আবিষ্কার করলে, মাইনের তাগাদা করলেই সে ইস্কুল কামাই আরম্ভ ক'রে দেয়, তার দুর্দান্তপনা বেড়ে যায়। সে তার মাইনে চাওয়া বন্ধ ক'রে দিলে। ছেলেটা দেখতে দেখতে পাল্টে গেল। সে বৃত্তি পাবে।

সীতারাম তাকেই পড়াচ্ছিল। এই তার জয়ের দ্বিতীয় সোপান।

হঠাৎ মণিলালবাবু এলেন পাঠশালায়। এই সীতারামের পাঠশালা! বাঃ! অ্যাঁ? বেশ! বেশ! এ যে বেশ করেছ হে! অ্যাঁ?

সীতারাম তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলে, বসুন, আপনি বসুন।

মণিবাবু বসলেন। নামটি তোমার খুব ভাল হয়েছে পণ্ডিত—সন্দীপন পাঠশালা।

সীতারাম বললে, ও নাম আমার দেওয়া নয়। ধীরাবাবু দিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মণিবাবু, তারপর বললেন, কই রে? অ্যাঁ?

চাকর এসে ঢুকল একটি ছেলের হাত ধ'রে।

মণিবাবুর পৌত্র। তাঁর ছেলে ধীরাবাবুর বয়সী, ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত প'ড়ে পড়া ছেড়েছেন। এটি তাঁরই ছেলে।

মণিবাবু বললেন, আমার এই পচুকে, শ্রীমান পঞ্চাননকে তোমার পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দিতে এলাম। নাও, ভর্তি ক'রে নাও। আর একটা কথা। একে তোমাকে প্রাইভেটও পড়াতে হবে। মোট কথা, গোড়া পত্তন ক'রে দিতে হবে।

সীতারামের মনে হ'ল, এমন শুভদিন আর বুঝি আসে নাই তার জীবনে। মণিবাবুকে প্রণাম ক'রে পঞ্চাননকে ভর্তি ক'রে নিলে সে। বললে, বাবু, প্রাইভেট পড়ানো আমার পক্ষে আর হবে না। বাড়ির কাজ—। তবে লোক আমি দেখে দোব।

মণিবাবু একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, বললেন, আচ্ছা, তবে লোক দেখে দিও। দেবে তা জানি। তুমি সৎ লোক। তুমি হ'লেই ভাল হ'ত।

সীতারাম চুপ ক'রে রইল।

মণিলালবাবু চ'লে গেলেন। সীতারাম নোট ক'রে রাখলে দিন-তারিখটি তার একখানি খাতায়। এই খাতায় সে লিখে রাখে তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলি। ধীরাবাবু তাকে ব'লে গিয়েছেন, মাস্টার, তোমাকে নিয়ে আমি বই লিখব। তুমি বুড়ো হও। আমি তখন একদিন আসব। এসে তোমার জীবন-কথা শুনে যাব।

সীতারাম তাই খাতা বেঁধেছে। সে লিখে রাখে জীবনের স্মরণীয় ঘটনা এবং তারিখগুলি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান যেদিন এসেছিলেন, সেই তারিখটি সে প্রথম লিখেছে। তারপর লিখেছে জয়ধরের বৃত্তি পাওয়ার তারিখ। মাত্র দুটি তারিখ লেখা হয়েছে। সাদা খাতাটা উল্টে মধ্যে মধ্যে তার হাসি পায়। আপনার মনেই হাসে। কি লিখবে ধীরাবাবু? জীবনের রঙে দীপ্তি নাই, সুরে বাহার নাই, এ নিয়ে ছবি হয় না, এ নিয়ে গান হয়।

তবু লিখে রাখে। আজও রাখলে—৫ই ফেব্রুআরি, ১৯২৬।

* * *

বলবে—সব কথা সে বলবে ধীরাবাবুকে, তার জীবনের যত কথা। ধীরাবাবু লিখবে—

কচি কচি মুখগুলি সন্দীপন পাঠশালা আলো ক'রে কলরবে মুখরিত ক'রে পড়ে, খেলা করে ছাত্রের দল। তারা পড়ে, অ, আ, হচ্য ই, দীঘ্য ঈ।

হ্যাঁ। তারপর, এটা কি? বল বল। হ্রস্ব—। ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেয় সীতারাম। আধ-আধ ভাষায় ছেলেটি বলে, হচ্য উ, দীঘ্য ঊ।

বাঃ, বাঃ! বল।

উৎসাহে কচি মুখ ভোরবেলার সূর্যের ছটা-পড়া কচি পাতার মত ঝলমল ক'রে ওঠে, সাদা চোখ ঝিকমিক ক'রে ওঠে সবুজ ঘাসের পাতায় জ'মে-থাকা শিশিরবিন্দুর মত। সে প'ড়ে যায়, ঋ। এতা? এতা কি মাছায়?

লিকার কেমন ডিগবাজি খায়। এতা মাছায় ৯।

ওদিকে পড়ে।—অ আর চ আর ল, অচ—ল। অ, ধ আর ম, অধ—ম।

হ্যাঁ। ও দুটি যেন হবে না তুমি, বুঝলে?

বর্গীয় জ, ল, প, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জল পড়ে—জল পড়ে।

সীতারাম নিজে বলে, পয়ে আকার, তয়ে আকার, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, পাতা নড়ে—পাতা নড়ে। জল পড়ে, পাতা নড়ে। বর্গীয় জ, ট, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জট নড়ে—জট নড়ে। কই, তোমার জটটি নেড়ে দাও দেখি একবার। ছেলেটির মাথায় বড় বড় চুল, তার মধ্যে দুটি জট তৈরি হয়েছে, দেবতার কাছে মানসিক আছে। এখানকার প্রচলিত আদরের ছড়া ব'লে সীতারাম তাকে আদর করে জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে।

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে থাকে। এর মধ্যেই সে মাথার জটের জন্য লজ্জা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সীতারাম নিজেই জট নেড়ে দেয় তার। বড় ক্লাসের ছেলেরা পড়ছে—

"আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর।"

তারা দাঁড়িয়ে সুর ক'রে আবৃত্তি করে—

"কোন্ দেশেরই তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দুর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার কমল
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ—"

সতারাম ভাই! ভাল আছ তো?

কে? সীতারাম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। সেই পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়। আঃ, এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর! লোল-মাংস ঝুলে প'ড়ে দেহের হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে, কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছেন, লাঠি ধ'রে পাঠশালার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। পরনে ময়লা কালো কাপড়, তার মধ্যে বড় বড় সেলাইয়ের দাগগুলি কালো মাটির ফাটলের দাগের মত দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে নেমে এগিয়ে গেল সীতারাম। আসুন, আসুন। কি ভাগ্য আমার!

তোমার ভাগ্য! হা-হা ক'রে হাসলেন পণ্ডিত।

ভাগ্য বই কি। নিশ্চয় এ আমার সৌভাগ্য।

মঙ্গল হোক তোমার। ভাল লোক তুমি। এখন কিছু খাওয়াও দেখি ভাই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সীতারাম, ওরে! গোবিন্দপদ শোন্ তো বাবা।

পণ্ডিত ব'লেই যান, জান তো, ভিক্ষা করি, হ্যাঁ, ভিক্ষাই এক রকম। গৃহিণী খালাস পেয়েছে। তা শ্রাদ্ধ তো একটা করতে হবে। তাই গিয়েছিলাম পলাশবুনি। হোক সব চাষীভূষী, এককালের ছাত্র তো সব। কিছু ভিক্ষা-টিক্ষা ক'রে বাড়ি যাব। দুপুর হয়েছে, বিশ্রাম চাই, ক্ষিদে-তেষ্টাও পেয়েছে। তা একবার ভাবলাম, যাই বাবুদের ঠাকুরবাড়ি কি কোন বাবুর বাড়ি। কিন্তু ইচ্ছা হ'ল না। তোমার কথাই মনে হ'ল। শাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। কিন্তু বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখিরি-ব্রাহ্মণ তো এক নয়। মনে হ'ল, পাঠশালার পণ্ডিতস্য পাঠশালার পণ্ডিতং গতি। তাই এখানেই এলাম। ব'লে আবার হা-হা ক'রে হাসতে লাগলেন পণ্ডিত।

এ হাসিতে সীতারাম লজ্জা পেলে। মনে হ'ল, পণ্ডিত তার

তোশামোদ করছেন। সে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেই একখানা খাতার মলাট দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। বললে, বেশ করেছেন। আমার যে কি আনন্দ হয়েছে আপনি পায়ের ধুলো দেওয়ায়, সে কি বলব? তেল আনাই, স্নান করুন।

স্নান? তা—। পণ্ডিত নিজের গামছাখানা মেলে ধ'রে একবার দেখালেন। কাপড়ের চেয়েও ময়লা গামছাখানা, তার উপর শতছিদ্র। দেখে বললেন, কাপড় তো নাই সঙ্গে। একখানা প'রে স্নান করা—। আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন পণ্ডিত।

খাতার মলাটখানা তাঁর হাতে দিয়ে সীতারাম বললে, আপনি ছেলেগুলোকে একটু দেখবেন। আমি আসছি।

সে ফিরে এল একখানি নূতন কাপড় এবং শিশিতে খানিকটা তেল নিয়ে। বললে, তেল মাখুন। স্নান ক'রে এই কাপড়খানা পরুন।

বুড়োর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

পণ্ডিতকে বিদায় ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশি নাশী। পণ্ডিত নিজেই ব'লে গেলেন কথাটা। স্নান ক'রে খেয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, ভায়া, ছেলেদের কাছে দু পয়সা, চার পয়সা চাঁদা যদি তুলে দিতে। বোঝ তো, পত্নীদায়! মাতৃদায়, পিতৃদায় নয়, পত্নীদায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের! ব'লে আবার হা-হা ক'রে হেসেছিলেন। ছেলেদের কাছ থেকে এক টাকা সাত আনা উঠেছিল, সে নিজে এক টাকা এক আনা দিয়ে আড়াই টাকা পূর্ণ ক'রে তার হাতে দিয়েছে।

যাবার সময় পণ্ডিত ব'লে গেছেন, একটি কথা ব'লে যাই ভায়া। জান তো, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য। বুড়োর কথাটা মনে রেখো। এই বড় বড় দালান-কোঠা হয়, দেখেছ তো? তা রাজমিস্ত্রিতে গাঁথে নকশা কাটে, কারিগুরি দেখায়, মাইনে নিয়ে বিদেয় হয়। বড়লোক বাস করে,

বাড়ি হয় তাদের। তবু রাজমিস্ত্রিদের নাম, মিস্ত্রিরা লিখে রেখে যায়। অমুক রাজ, এত শো এত সাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা তাদের নামটা থাকে। মজুরিও তারা মন্দ পায় না। আমাদের পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি পায়। কিন্তু দেখ, গোড়াতেই প্রথম যারা কাজ করে, ভিত কাটে, মাটি-কাটা মজুর তাদের কেউ মনেই রাখে না। তাদের মজুরিও সকাল থেকে তিন প্রহর পর্যন্ত মাটি কেটে—চার আনা। বুঝলে তো! পেটে খেতেই কুলোয় না। তারা শেষ বয়সে না খেয়ে মরে। যদি বাবুদের বাড়ি যায়, বলে, বাবু মহাশয়, আমি আপনার প্রাসাদের ভিত্তি খনন করিয়াছিলাম; আজ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছি; অতএব আমাকে কিছু ভিক্ষা দিউন। বাবু কি করবে? চিনতে পারবে না। ভায়া, ভিক্ষা দেওয়া দূরের কথা, দরোয়ান ডেকে বার ক'রে দেবে। ইস্কুল-কলেজের মাস্টাররা হ'ল বড় রাজমিস্ত্রি, বড় রাজমিস্ত্রিদের নাম থাকে। আমরা পাঠশালার পণ্ডিত, আমরা হলাম ভিত-খোঁড়ার মাটি-কাটা মজুর। আমাদের কেউ মনে রাখে না। গেলে চিনতেও পারে না—। ভিক্ষা দিলে দু আনা, বড় জোর চার আনা। তাই বলি—। অনেকটা কথা ব'লে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। একটু থেমে আবার বললেন, কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রো। বুঝলে? তোমার অবশ্য কিছু জমিজেরাও আছে, আমার মত অবস্থা তোমার হবার কথা নয়। তবুও বৃদ্ধের কথা মনে রেখো। এমন ক'রে, এই আমাকে যেমন কাপড় দিলে, খাওয়ালে, টাকা দিলে, এমন ক'রে খরচ ক'রো না। কিছু কিছু সঞ্চয় করতে অভ্যাস ক'রো।

সীতারাম ফিরে এসে পাঠশালায় চেয়ারে ব'সে ভাবে। পণ্ডিত তাকে অবসন্ন ক'রে দিয়ে গেলেন। নিজের ভাবনা এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। পণ্ডিত তো মিথ্যা কথা বলেন নাই। আরও অনেক কথা বলেছেন পণ্ডিত। সারা দুপুরই তিনি অনর্গল ব'কে গিয়েছেন।

কাপড়খানি আর আড়াই-টাকা সাহায্য পেয়ে তিনি হাসিতে কথায় সীতারামকে তাঁর জীবনের সকল কথা উজাড় ক'রে ব'লে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

হঠাৎ সে উঠে নিজের খাতা, সেই নোট-বইটা বের ক'রে লিখতে বসল। আজ বারোই জুলাই, উনিশশো উনত্রিশ সাল।

ধীরাবাবু বলেছে, পণ্ডিত, তোমার বুড়োবয়সে এসে তোমার কথা শুনব। তোমার কথা শুনে বই লিখব আমি।

বুড়ো পণ্ডিতের কথা তার নিজের কথা নয়। তবু সে লিখে রাখলে পণ্ডিতের কথাগুলি। পণ্ডিতের কথায় আর তার নিজের কথায় তো কোন তফাত সে দেখতে পায় না। সে লিখে রাখছে, ধীরাবাবুকে বলবে, এমনই ক'রে লিখো। তবেই ঠিক লেখা হবে। নইলে, তুমি যা লিখবে, সে হয়তো ঠিক হবে না। পাঠশালার পণ্ডিত সীতারামের জীবনী হবে না।

এক ব্রাহ্মণের ছেলে। বাপ করতেন চাষীদের গাঁয়ে পুরুতের কাজ, আর করতেন যজ্ঞি-বাড়িতে রান্নাবান্নার ঠিকের কাজ। লোকে কেউ বলত, চাষার পুরুত পটোঝাড়া বামুন, কেউ বলত, ভাতরাঁধুনী। কিন্তু এতে অপমান তার যতই হোক, মোটামুটি খাওয়া-পরার অভাব বড় হ'ত না। ছেলে, সেকালের হাল আমলের ছেলে, পড়ত ছাত্রবৃত্তি, সেকালের এম. ভি—মিডল ভার্নাকুলার ইস্কুলে, সেখানে পাস ক'রে সে বাপের বৃত্তি ছেড়ে হ'ল পাঠশালার পণ্ডিত। পণ্ডিতের কাজ, পটোঝাড়া বামুনের কাজের চেয়ে অনেক সম্মানজনক, রাঁধুনী-বামুনের কাজের কথা ভাবতেই লজ্জা। সে হ'ল পাঠশালার পণ্ডিত পলাশবুনি নামে একটি সদ্গোপ চাষীর গ্রামে গ্রামের মণ্ডলদের সুপারিশে, জমিদারের অনুগ্রহে।

আঃ, এ কি হ'ল? চোখে জল এল না কি? ঝাপসা ঠেকছে

লেখাগুলো, লিখতে গিয়ে লাইন বেঁকে যাচ্ছে! পেন্সিল রেখে সীতারাম হাত দিয়ে চোখ মুছলে। হ্যাঁ, চোখে জল পড়ছে। জল মুছে পরিষ্কার হ'ল দৃষ্টি। সে আবার লিখলে।

জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা করবার হুকুম পেলে। ওইখানেই সে থাকবে। মণ্ডলরা প্রত্যেক মাসে একদিন ক'রে তাকে খাবার সিধে দেবে। গ্রামে আটাশ ঘর অবস্থাপন্ন মণ্ডল আছে, তারা দেবে আটাশ দিন সিধে। বাকি দু দিন নিজেকেই তাকে চালাতে হবে। তার জন্য সে ভাবলে না, আটাশ দিনের সিধে থেকে, দু দিন কেন, আরও সাত দিনের খোরাক তার উদ্বৃত্ত হবে। দৈনিক পাঁচ পোয়া চালের এক পোয়া ক'রে কাটলে, আটাশ পোয়া সাত সের চাল বাঁচবে সাত দিনের।

আঃ, ছি ছি! আবার চোখে জল এসে গিয়েছে। কিছুদিন, এই মাস খানেক বোধ হয়, এই এক উপসর্গ জুটেছে। চোখে জল পড়ছে। বিশেষ ক'রে এই বিকেলের দিকে, পাঠশালার শেষ দিকটায় জল বেশি পড়ে। মাথাও ধরে। ডাক্তারকে একবার দেখাতে হবে। যাক, পরে লিখলেই হবে। পণ্ডিতের কথাগুলো কানের কাছে এখনও যেন বাজছে।

পণ্ডিত বলেছেন, ভায়া, আজ মনে হয়, দুর্মতি হয়েছিল। নইলে ভেবে দেখ, হিসেব ক'রে দেখ, হিসেব ক'রে দেখ, পুরুতের রোজকার পণ্ডিতের রোজকারের চেয়ে অনেক বেশি। চাল, কাপড়, দক্ষিণে হিসেব ক'রে দেখ তুমি। আর ঠিকের ভাতরান্নার কাজের রোজকার তো দিন দিন বেড়ে চলেছে। একবেলা এক টাকা, দুবেলা দু টাকা। ভাত-রাঁধুনী বামুনের মাস-মাইনেই এখন খোরাক-পোশাক আট টাকা দশ টাকা। তা ছাড়া বাবুদের কুটুম্বস্বজন, আউতি-যাউতি, দুটো টাকা বকশিশ মাসে। পাঠশালার পণ্ডিতি ক'রে ভেরেণ্ডা ভাজলাম সারাজীবন। ব'লেই হা-হা ক'রে হাসি।

তারপর বলেছিলেন, কিছু মনে ক'রো না ভায়া, সত্য কথা বলব।

তুমিও আমার মত ভুল করেছ। চাষী সদ্‌গোপের ছেলে, বাপ-পিতামহ নিজের জমি চাষবাস ক'রে, আর দু-চার জনের দু-দশ বিঘে জমি ভাগে ক'রে দুধে ভাতে খেয়েছে, গোলাতে ধান, ঘরে কলাই গম গুড় মজুত ক'রে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে। তুমিও আমারই মত দগ্ধকচু ভক্ষণ করেছ ভায়া। পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে লেখাপড়া শিখে সভ্য-শিক্ষিত হতে গিয়ে অন্যায় করেছ।

হঠাৎ তার হাতটা ধ'রে বলেছিলেন, কিছু মনে করছ না তো ভায়া ?

না, না। আপনি সত্য কথা বলছেন। কিছু মনে করব কেন ?

হ্যাঁ। তোমাকে জানি ব'লেই বলতে সাহসী হলাম। নইলে এখন তো আমি ভিক্ষুক, আমি—

সীতারাম ভাবে, তার জীবনে কি হবে কে জানে ? আবার তার চোখে জল এল। এ জল আসা, সে জল আসা নয়। এ তার মন কাঁদছে, তাই জল এসেছে। চোখ মুছলে সে।

পাঠশালার দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। এসে ঢুকলেন ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টরবাবু। নতুন লোক, অল্পদিন এসেছেন, অল্পবয়স, কড়া লোক। বাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখেছে, মোটামোটা ইংরেজী বই নিয়ে পড়েন। বইয়ে আর মুখে। একটা শেল্‌ফে ঝকমকে বাঁধানো বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বই। দু-তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে থাকেন। বারবেলার চিঠিও আসে। মধ্যে মধ্যে হাসতে হাসতে বলেন, পণ্ডিত, তোমাদের ধীরাবাবুকে কি রকম ঠুকেছে, দেখ। 'কুকুর' ব'লে দিয়েছে হে। লিখেছে, লেখাটি একেবারে—হিজ মাস্টার্স ভয়েস।

গম্ভীরভাবে সাব-ইন্সপেক্টর খাতাপত্র নিয়ে বসলেন। নোট নিলেন। ইন্‌সপেকশন বুকে মন্তব্য লিখলেন।

তিনি চ'লে গেলে পাঠশালার ছুটি হ'ল। ঢং-ঢং-নন-ন-ন-ন্। আবার পরদিন এগারোটায় পাঠশালা বসে। ঢং-ঢং-ঢং।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

বৎসরের পর বৎসর চলবে। সীতারামের চুলে পাক ধরবে। মুখে কপালে রেখা দেখা দেবে। হয়তো সবশেষে ওই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত অবস্থা হবে। লিখবে ধীরাবাবু, এই লিখবে, এই তার জীবন।

শ্রান্ত ক্লান্ত নীরস বিরস হয়ে আসছে যেন জীবন ক্রমে ক্রমে।

এরই মধ্যে আসে এক-একটা ঢেউ।

সেদিন সাবইন্সপেক্টর এসে বললে, পণ্ডিত তোমাদের এখানে প্রাইমারি টিচার্স কন্‌ফারেন্স হবার কথা হচ্ছে। শুনেছ?

আজ্ঞে না।

আসবে খবর তোমার কাছে।

খবর এল। বড় ইস্কুলের পাঠশালার হেডপণ্ডিত শ্রীশবাবু এর উদ্যোক্তা। তিনি এলেন সদলবলে। শ্রীশবাবু লোকটি বহুদর্শী লোক, উপযুক্ত শিক্ষক, অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। দোষের মধ্যে নিপুণ ষড়যন্ত্রী। তা হোক, তিনি যখন এসেছেন, আর এই কন্‌ফারেন্স—জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন যখন সকলের উপকারের জন্য, তখন সে প্রাণ খুলে যোগ দেবে।

তাদের দুস্থ অবস্থার কথা জানানো হবে দেশের কাছে, গভর্মেণ্টের কাছে দাবি জানানো হবে। বুকে যেন একটু বল আসছে।

অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করা হ'ল। এই থানার পাঠশালার পণ্ডিতদের কাছে থেকে চাঁদা তুলে সমস্ত খরচ চালাতে হবে। তাদের মধ্য থেকে, পনেরোজনকে নেওয়া হ'ল অভ্যর্থনা-সমিতিতে। গোপালপুরের হৃষিকেশ দাস, বৃদ্ধ পণ্ডিত, গোবিন্দপুরের সৌরীন মিত্র, বয়সে সে ছোকরা, ব্যাপারীপাড়ার মক্তবের মৌলবী মহম্মদ হোসেন, রত্নহাটের সকলেই, বড় ইস্কুলের তিনজন এবং সন্দীপন পাঠশালার সীতারাম, এমনই ক'রে পনেরো জন।

সীতারাম হ'ল দুজন সহকারী সম্পাদকের অন্যতর।

এটা একটা উৎসাহজনক ব্যাপার। এমন ঘটনা জীবনে কম এসেছে। এসেছিল মাত্র আর একবার, সেই যেবার ধীরাবাবু ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কংগ্রেসী চেয়ারম্যানকে নিয়ে এসে সভা করেছিলেন—সেইবার।

সীতারামের চোখের দোষ ঘটেছে। চশমা একটা না নিলেই নয়। জল পড়ে, ঝাপসা দেখছে, কিন্তু তবু নোট-বইয়ে সে লিখলে, উনিশ শো তিরিশ সাল, ছাব্বিশে জানুআরি। ওই তারিখে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন।

তারিখটার জন্য সে একটু দুঃখিত হ'ল। ওই তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দিবস পালনের জন্য। কিন্তু উপায় কি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্বোধন করবেন, তিনি দিয়েছেন ওই তারিখ। ওই তারিখে দেবু এখানে কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করবে, সংকল্পবাণী পাঠ করবে। ধীরাবাবু তাকে লিখেছেন, আমি যেতে পারছি না কিন্তু আমার গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হবে না, এ কথা ভাবতে আমার মর্মান্তিক দুঃখ হয়। তুমি পালন করবে।

ধীরাবাবু ঢেউ পাঠিয়েছেন। জয়-জয়কার হোক ধীরাবাবুর। কিন্তু ধীরাবাবু, তুমি এলে না কেন? ঢেউ কি স্রোত? তোমার কাজ কি দেবুকে দিয়ে হয়?

মর্মান্তিক দুঃখ তার দেবু আর শ্যামুর জন্য। তারা ম্যাট্রিক পাস ক'রে ব'সে আছে। শ্যামু আই. এস-সি. ফেল ক'রে বাড়ি এসেছে। দেবু তিনবারের বার কোনরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছে। দেবুকে দিয়ে কি ধীরাবাবুর কাজ হয়?

যাক ও কথা। সামান্য পাঠশালার পণ্ডিত সে। আদার-ব্যাপারী সে, জাহাজের খোঁজ নিয়ে কি করবে? সম্মেলনের জন্য সে শ্যামু-দেবুর

কাছে মাছ ভিক্ষা করলে, আধ মণ মাছ দিতে হবে। আমি বলেছি, আমি আদায় ক'রে দোব। আমার মান রাখতে হবে।

ধীরাবাবুকে সে চাঁদার জন্য লিখেছে। ধীরাবাবু দশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেদিন সকালে, সবচেয়ে বড় আনন্দ পেলে সে। মনোরমা তার হাতে দুটি টাকা দিলে, তোমাদের ইয়েতে ওই যে কনফাস না কি হচ্ছে, তাতে আমার চাঁদা।

তোমার চাঁদা? আমি তো দিয়েছি, আবার?

তোমাদের মাইনে বাড়বে, মান বাড়বে, আমি চাঁদা দোব না?

সময় নাই। রত্নহাটে ঢোল বাজছে, তার শব্দ এখান পর্যন্ত আসছে, শোনা যাচ্ছে।

ওই এক বিড়ম্বনা!

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসবেন, উদ্বোধন করবেন। সাহেবের বাতিক পল্লীনৃত্য। সাহেব এসে অবধি জেলায় এই নাচ নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে বেড়াচ্ছেন। শিব নাচেন, ব্রহ্মা নাচেন, আর নাচেন ইন্দ্র—সরকারী হাকিমরা নাচছেন, রায়বাহাদুররা নাচছেন, উকিলরা নাচছেন, মোক্তাররা নাচছেন, বড় ইস্কুলের ছেলেরা নাচছেন, মাস্টাররা নাচছেন, এবার তাদের পালা। পাঠশালার ছেলেদের নাচতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হবে।

না নেচে উপায় কি? নাচতে হবে।

আবার নতুন সাহেব এসে যদি বলে, মাথা নিচু ক'রে উপরের দিকে পা তুলে হাঁটতে হবে, তাই করতে হবে। উপায় কি?

তবু রক্ষা ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স, রায় বাহাদুর মিত্র সাহেবের কোন বাতিক নাই। তিনিই হবেন সভাপতি।

ত্রিশ সালের ছাব্বিশে জানুআরি।

সুসজ্জিত মণ্ডপে অধিবেশন হ'ল। ভাগ্যক্রমে সীতারাম দাঁড়াতে পেয়েছিল সভাপতির আসনের কাছেই।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হয়ে গেল আজ। নজরে পড়ল, সভার বাইরে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শিবকিঙ্কর। সে ইশারা ক'রে তাকে ডাকছে। সীতারাম সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

শিবকিঙ্কর অনুগ্রহপ্রার্থীর মত সবিনয়ে বললে, আমাকে ভেতরে একটু বসিয়ে দিতে পার ভাই পণ্ডিত ?

সীতারামের জিভের ডগায় এল, না। কিন্তু পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ ক'রে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, আসুন।

সভাপতির অভিভাষণ তখন আরম্ভ হয়েছে। একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ তিনি জানালেন, গভর্মেণ্ট-পরিকল্পনায় আছে, দেশের সর্বত্র, প্রতি গ্রামে না হোক, প্রত্যেক পাঁচ-সাতখানি গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। সমস্ত দেশের ছেলেরা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে স্নান ক'রে ধন্য হতে পারে, তার ব্যবস্থা হবে। সেই সব কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষক থাকবেন, আপনারাই থাকবেন, তাঁদের বেতন যাতে উচ্চ হয়, যাতে তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর হয়, তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। আপনারাই হচ্ছেন দেশের আদি গুরু। আপনারা সামান্য নন।

আনন্দে চোখে জল এল সীতারামের। দৃষ্টি তার ক'মে এসেছে। আজকার চোখের জলে তার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখটায় সব যেন সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তেরো

ঝাপসা দৃষ্টি আর ফিরল না। চশমা নিয়েও সীতারাম আর ভাল দেখতে পায় না। দীর্ঘকাল আর লেখা হয় নি কিছু নোট-বইয়ে। অনেককাল পরে আজ সে নোট-বই খুললে। ১লা জানুআরি, ১৯৪৬।

আন্দাজে পেন্সিল দিয়ে লিখলে সীতারাম তার নোট-বইয়ে। চোখে পুরু চশমা, তবু সে ভাল দেখতে পায় না। আজ ধীরাবাবু আসবেন। ধীরাবাবু এখন বড় লেখক। দীর্ঘকাল পরে দেশে আসছেন। রত্নহাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবুদের সমাজটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। উনিশ শো তিরিশ সালে স্বদেশীর আর একটা ঢেউ এসেছিল। সে ঢেউকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নাই বাবুদের সমাজ। তারা আরও ছোট হয়ে গিয়েছিল। তারপর এল এই যুদ্ধ, উনিশ শো উনচল্লিশ সালে। উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে—দুনিয়াজোড়া যুদ্ধে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল। সর্বনাশা যুদ্ধ! রত্নহাট দেখলে কান্না পায়। ঝড়, মহামারী, বন্যায় মানুষ মরল কীটপতঙ্গের মত। ঘর ভাঙল, জমি ভ'রে গেল বালিতে। যুদ্ধ নিয়ে এল দুর্ভিক্ষ, গরিবেরা হ'ল দেশত্যাগী। বাপ ছেলে বেচলে,—তারই পাঠশালায় পড়ত, এমন ছেলেও বিক্রি হয়েছে। মেয়ে চালান গেছে। সীতারাম ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় যে, ভাগ্য তার দৃষ্টিশক্তিকে হ্রাস ক'রে দিয়েছে—এক রকম নিঃশেষে হ্রাস ক'রে দিয়েছে বললেই হয়। ধীরাবাবু আসছেন এই ধ্বংসোন্মুখ রত্নহাট দেখতে। লেখক তিনি, তাঁর অভিপ্রায় সে বুঝতে পারবে না। তবে যদি কাঁদতে আসেন, তা হ'লে আসুন। ধীরাবাবু ব'সে ব'সে কাঁদুন।

তার বাড়িতেই আসবেন ধীরাবাবু দেখা করতে। চোখে তার জল এল, কান্নার জল। কি দেখবেন ধীরাবাবু? কি দেখাবে সে ধীরাবাবুকে।

মনোরমাহীন এই বাড়িখানা তার দেখতে ইচ্ছা হয় না। ১৯৩৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর মনোরমা মারা গিয়েছে। বড় শোক পেয়েছিল মনোরমা। নিষ্ঠুর আঘাত। ১৯৩৫ সালের ৮ই এপ্রিল রত্না বিধবা হ'ল। রত্না তাদের একমাত্র কন্যা—সাধ ক'রে অনেক খুঁজে নাম রেখেছিল রত্নাবলী। লেখাপড়া জানা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। আই. এ. পড়ছিল। হঠাৎ জ্বর হয়ে বিকার হ'ল, চলে গেল ছেলেটা। সে আঘাত মনোরমা আর সহ্য করতে পারলে না। কেঁদে কেঁদে কান্নার আর শেষ হ'ল না তার। অবশেষে শয্যা পাতলে—শেষ শয্যা।

দুঃখের তপস্যাই তো চিরকাল করলে সীতারাম। দুঃখের মধ্যেই সে ভাল থাকে, বুকে বল পায়, মনে সান্ত্বনা পায়, শান্তি পায়। কানাই রায় মধ্যে মধ্যে বলত—সীতারাম, কি রকম মানুষ তুমি বল দেখি। হাসি নাই, খুশি নাই, সাধ নাই, আহ্লাদ নাই। যাতে ভাল হবে, লোকে যেচে তা দিলেও তুমি নেবে না, চব্বিশ ঘণ্টা মুখ দেখে মনে হয়, আহা, মানুষটা বুঝি কত দুঃখ ভোগ করছে! যাতে দুঃখ হবে, তাই তুমি খুঁজে খুঁজে করবে।

সে উত্তর দিয়েছিল, সংসারে দুঃখই তো আসল জিনিস রায়কাকা। দুঃখ ছাড়া সংসারে আছেই বা কি, বল?

রায় বলেছিল, কে জানে বাবা, দুঃখ কাকে বলে তা বুঝলাম না।

বুঝলে না? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সীতারাম।

কে জানে! হাসলাম, খেললাম, দিন ফুরিয়ে গেল। অবিশ্যি নাচতে গেলে হোঁচোট লাগে, বাঁচতে গেলে অসুখ করে, লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলে ঝগড়াও হয়, সে কি আবার দুঃখ নাকি?

সমস্ত জীবনটাই বুড়োর এই একভাবে কেটেছে। উপপদ-তৎপুরুষ সবখানে ঠিক নিজে গিয়ে আগেভাগে জেঁকে বসেছে, কেউ কথা শুনবে না, তবু সে বলতে ছাড়ে নাই। কাজ করেছে, দস্তুরি আদায় করেছে,

আমোদ করেছে, বাবুদের সংসারটির হিতকামনা করেছে। বুড়ো শেষটায় বড় কষ্ট পেয়েছিল। নিউমোনিয়া হয়ে মরেছে কানাই রায়। বাবুদের বাড়িতেই মরেছিল। সেবা করেছিল সীতারাম। সমস্ত রাত্রি জেগে ব'সে থাকত। প্রলাপ বকত রায়, আঁঃ-আঁঃ শব্দে বুকের যন্ত্রণাতে কাতরাতে কাতরাতে হঠাৎ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে আঙুল বাড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠত, মরল রে, মরল রে, মরল রে! গেল, গেল, গেল!

কি হ'ল? রায়-কাকা! রায়-কাকা!

যা, শালা বেঁচে গিয়েছে—খুব। হি-হি ক'রে হেসে উঠত।

মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হ'ত। সকালের দিকটায় সুস্থ থাকত। সীতারাম প্রশ্ন করত, কেমন মনে হচ্ছে রায়-কাকা?

বুকে হাত দিয়ে বলত, বড় কষ্ট।

রায় বলেছিল, মাকে বল, দেবুবাবুকে শ্যামুবাবুকে বল, আমাকে—

কি?

থাক্, বড় ডাক্তারে কি আর মানুষ বাঁচাতে পারে? পরমাই থাকলে বাঁচব। কিন্তু সমস্ত জীবনটা কি করলাম সীতারাম?

ওই ভাবনা ভাবতে ভাবতে রায় মরেছে। সেও বুঝে গিয়েছে, সুখের মধ্যে সুখ নাই। দুঃখের মধ্যেই সুখ আছে। ফুল শুকিয়ে ঝরার মধ্যে ফল ধরে। ফল পেকে খ'সে পড়ে মাটিতে, গ'লে প'ড়ে যাওয়ার মধ্যেই নতুন গাছ জেগে ওঠে।

তা ছাড়া তার জীবনের দুঃখগুলোই যে বড়। সুখের কি পেলে সে? যা পেয়েছে, দুঃখকে সহ্য ক'রেই সে পেয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে সীতারাম। প্রথম জীবনে দুঃখকে সহ্যশক্তি দিয়ে সে জয় ক'রে সুখ পেয়েছিল। শেষ-বয়সের কটা দুঃখ তার অসহ্য হয়ে উঠেছে। যাদের সে আজও পর্যন্ত পড়ালে সংখ্যায় তারা পাঁচ শোর কম নয়। কিন্তু পাঁচজনও তাদের মধ্যে মানুষের মত মানুষ হয় নাই।

জয়ধর শুধু মুন্সেফ হয়েছে। বাবুদের নরেন রেলে ভাল চাকরি করে। সাহাদের কটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিন্তু এরা কি কেউ মানুষের মত মানুষ! খুব বড় মানুষ বাদ দিয়ে একটা ছেলেও তো ধীরাবাবুর মত হতে পারলে না।

দেবু-শ্যামুর জন্য তার সবচেয়ে বেশি দুঃখ। শ্যামু একটা চাকরি করছে। অত্যন্ত সাধারণ চাকরি। দেবু সংসার নিয়ে আছে। রূঢ় রুক্ষভাষী দেবু, দিনরাত্রি লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছে। ওটাই তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা মানুষ হ'লে বোধ হয় সে সবচেয়ে সুখী হ'ত।

এত দুঃখ সে জয়ধরের উপেক্ষায় অবহেলাতেও পায় না। জয়ধর এই পথেই বাড়ি যায়, বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যায়। সে দেখা করে না। অথচ হাই স্কুলের মাস্টারদের সঙ্গে দেখা করে মধ্যে মধ্যে।

চোখের চিকিৎসার জন্য মধ্যে সে একবার পুরনো ছাত্রদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। জয়ধর পাঁচটা টাকা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কুপনে একছত্রও লিখবার অবকাশ হয় নাই তার। নরেন তবু নিজে হাতে এসে দিয়েছিল দশটা টাকা! বাকি ছাত্ররা কেউ আট আনা, কেউ এক টাকা। অনেকে দেয়ই নাই কিছু। দেবু-শ্যামুকেও বলেছিল। তারা দিয়েছিল দু টাকা। বলেছিল আপনি বরং দাদার কাছে চ'লে যান। তাঁকে অনেকে খাতির ক'রে। বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আছে। তিনি সব ক'রে দেবেন। বোধ হয় তারা লিখেওছিল তাঁকে। ধীরাবাবু তাকে নিজেই লিখেছিলেন। গিয়েছিল সে। ডাক্তারেরা বলেছে, চোখের ভিতর শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে কোন কারণে। ওষুধও তারা দিয়েছিল, কিন্তু ফল বিশেষ হয় নাই। চোখের দৃষ্টি তৈলহীন প্রদীপের মত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। যাক্।

ধীরাবাবুর মা বলেছিলেন, তুমি দীক্ষা নাও বাবা। বাইরের

আলো যখন কমতে শুরু করল, তখন ভেতরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা কর।

দীক্ষা সে নিয়েছে।

ওই এক মানুষ। চিরটা কালের মধ্যে যতখানি তাঁকে ভালবাসে, ততখানি তাঁকে ভয় ক'রে এল সে। সে ভয় তার এক দিন, এক তিল কমল না। তবে হ্যাঁ, বাবুদের বাড়ির রাণীমা, সত্যকারের রাণীমা ছিলেন তিনি।

মা শুধু একটা অন্যায় ক'রে গিয়েছেন। দেবু-শ্যামুর অনিষ্ট ক'রে গিয়েছেন কিছু। দিনকাল খারাপ হয়ে এল, তবু মা বাড়ির ক্রিয়াকলাপের নিয়ম এবং বরাদ্দের একটি তিল কমাতে দেন নাই। ফলে দেবু-শ্যামুর অবস্থা খারাপ হয়েছে বেশি। এ প্রস্তাব পর্যন্ত করবার উপায় ছিল না। সে কি দৃষ্টি! সে কি ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত তাঁর ঠোঁটে! রত্নহাটের বাবুদের সে আমলের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির প্রতিমূর্তি ছিলেন যেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই চ'লে গেল। মা চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁকে মনে ক'রে আজও সীতারাম ভয়ে সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়ে যায়, উদাস হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় দুঃখ আজ তার কর্মহীন জীবন।

সন্দীপন পাঠশালা উঠে গিয়েছে। তার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সে স্থির করেছিল, নিজে অবসর নেবে, তার কোন ছাত্রকে সে বসিয়ে দেবে তার আসনে। ছেলে নাই, জামাই নাই, আছে একমাত্র ছাত্রের দল। তাদেরই কাউকে বসিয়ে দিয়ে অবসর নেবারই কথা সে ভেবেছিল। হঠাৎ সরকার থেকে উচ্চ-প্রাথমিক অবৈতনিক ইস্কুল হয়ে গেল জেলাতে। শিক্ষা-করের আইন অনেকদিন আগেই পাস হয়েছে। এ জেলাতে গত বৎসর থেকে আদায়ও হচ্ছে। এ বৎসর ইস্কুল হয়ে গেল। পাঠশালা উঠে গেল। তাতে অবশ্য দুঃখ তার নাই। বিনা-

মাইনেতে দেশের সকল ছেলে পড়তে পাবে, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে! মনে পড়ে তার বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের কথা—অজ্ঞান অন্ধকার থেকে তাদের আলোতে নিয়ে এস। পড়ুক, আলো ছড়িয়ে পড়ুক। সুদিন আসুক। কিন্তু তবু তার একটা গভীর দুঃখ আছে—গভীর দুঃখ। তার পাঠশালার নাম ছিল—সন্দীপন পাঠশালা। আর বড় ইস্কুলের পাঠশালা-বিভাগের নাম ছিল— উইলিয়ম প্রাইমারি স্কুল। ওই স্কুল স্থাপনের সময় উইলিয়ম সাহেব জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর নামে ইস্কুল করায় সরকার থেকে বাড়ি করার খরচ দিয়েছিল। দুই পাঠশালাই নতুন নিয়মে উঠে গেল, কিন্তু উইলিয়ম নামটা বজায় থাকল। সন্দীপন নামটার কোন মূল্য নাই, নামটার সঙ্গে তার পাঠশালার সকল ইতিহাস ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। হাসি আসে সীতারামের। বটেই তো! সন্দীপন কে? উইলিয়ম যে সায়েব। রাজত্ব যে সায়েবদের। ভাবতে ভাবতে তার মন চ'লে যায় প্রসঙ্গান্তরে। মনে প'ড়ে যায় মহাত্মা গান্ধীকে। মনে প'ড়ে যায় জহরলালজীকে। মনে প'ড়ে যায় সুভাষচন্দ্র বসুকে। সুভাষচন্দ্র—মহা বীর সুভাষচন্দ্র। তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে সৈন্যদল গঠন করেছিলেন ইংরেজের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য। কলকাতায় ধর্মতলায় কত ছেলে গুলি খেয়ে মরেছে বীরের মত! সীতারামের দুঃখ হয়, ওই সব ছেলেদের মধ্যে একজনও সন্দীপন পাঠশালার ছাত্র নয়। মনে মনে সে ভগবানের কাছে কামনা করে, স্বরাজ হোক। সন্দীপন মুনি নামকে অনাদর ক'রে উপেক্ষা ক'রে এইভাবে উইলিয়ম নামকে সমাদর করার ভ্রান্তি দূর হোক দেশের।

স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে সে, ঠোঁট কাঁপে। সন্দীপন নামের সঙ্গে সীতারামের নামও মুছে গেল।

ছেলেরা পাঠশালায় যায়। সে দাওয়ায় ব'সে ক্ষীণ দৃষ্টিতে চেয়ে

থাকে। সন্দীপন পাঠশালার সেই ঘড়িটা সে ঘরে এনে টাঙিয়েছে। তাতে দশটা বাজে ঢং ঢং ক'রে। সচেতন হয়ে ওঠে সীতারাম। পায়ের শব্দ, ছেলেদের গলার আওয়াজ শুনে সে প্রশ্ন করে, ইস্কুলে চললে সব?

হ্যাঁ।

ইস্কুল কেমন লাগছে?

ভাল?

ছেলে বাড়ছে দিন দিন?

হ্যাঁ। অনেক ছেলে হয়েছে।

অন্য একটি ছেলে বলে, অনেক বই এসেছে, বেঞ্চি এসেছে, ম্যাপ এসেছে, ছবি এসেছে।

সীতারাম হাসে। বলে, আমি দেখে এসেছি।

আরও এসেছে।

আরও এসেছে! আসবে বই কি। পড় সব, ভাল ক'রে পড়।

ছেলেরা চ'লে যায়। সীতারাম ভাবে। কালের গতিক আশ্চর্য। কালে কালে কত নূতন হ'ল, আবার কালে কালে কত নূতন হবে।

* * *

পণ্ডিত!

সীতারাম জীর্ণ অবনত শরীর সোজা ক'রে বসল। ধীরাবাবু! শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আনন্দে। সে দাঁড়িয়ে উঠল।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ধীরানন্দ। আমি এসেছি পণ্ডিত।

আমি জানি আপনি আসবেন। রত্না, আসন দে, আসন দে মা।

রত্না আগে থেকেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, আসন এনেছি বাবা।

দে, পেতে দে। আমার কাছে আয়। রত্নার মাথায় হাত দিয়ে বললে, আমার রত্না ধীরাবাবু। আমার শক্তিশেল। প্রণাম কর্‌ মা।

ধীরানন্দ তাকে আশীর্বাদ করলে।

সীতারাম বললে, লক্ষ্মণের চেয়েও আমি বেশি বীর ধীরাবাবু। শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হয়েছিলেন, হনুমানকে বিশল্য-করণীর জন্যে গন্ধমাদন আনতে হয়েছিল। আমি শক্তিশেল বুকে গেঁথে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সে হাসলে, তারপর বললে, কই, আপনি একটু এগিয়ে আসুন, দেখি আপনাকে, কত বড়লোক আপনি!

চোখে কি একেবারেই দেখতে পাও না মাস্টার?

পাই। ভাল পাই না।

তাই তো।

আর তাই তো কেন?

বয়স তো তোমার বেশি নয়।

পাঠশালার পণ্ডিত, যাদের মাসে আয় পনেরো টাকা, তাদের এই বয়সই ঢের। তা ছাড়া—। হাসলে পণ্ডিত। তারপর বললে, জানেন তো, সন্দীপন পাঠশালা উঠে গেল। শিক্ষা-কর্ বসল দেশের উপর। ফ্রী ইউ. পি. স্কুল হ'ল। আমার পাঠশালা তারই মধ্যে চ'লে গেল।

জানি। কিন্তু সেখানে চাকরি—?

নাঃ, আর নয়। চোখও গিয়েছে। কালও নতুন ধীরাবাবু। নতুন ভাল লোক এসেছে। বেশ লোক, ভাল ছোকরা। আলাপ ক'রে আনন্দ পেলাম। অনেক কথা হ'ল তার সঙ্গে। বললে কি জানেন? বললে, সব মানুষকে লেখাপড়া শেখাতে হবে—চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত। ধীরাবাবু, শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শেখাক, শেখাক। যদি বাঁচি, তবে সেদিন যেন একবারের জন্যেও দৃষ্টি ফিরে পাই। মানুষের সে মুখের চেহারা একবার দেখব।

ধীরানন্দ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, ওসব কথা থাক্ পণ্ডিত।

থাকবে?

হ্যাঁ। আমি তোমার নিজের কথা শুনতে এসেছি।

ওই তো আমাদের নিজের কথা গো। অ-আ ক-খ, লেখাপড়া সবাই শিখুক—এ ছাড়া পাঠশালার পণ্ডিত আমাদের আর কথা কি? যে না পারবে শিখতে, তাকে বেকুব, বেহুদ্দা, গাধা ব'লে গাল দোব। হাসতে লাগল সীতারাম।

সে আমি জানি। ও কথা আমি অনুমান করতে পারি। পণ্ডিত, তোমার কথা বল।

নেহাত আমার কথা নিয়ে বই লিখবে তুমি?

হ্যাঁ। বল তোমার কথা।

খাতাখানি তার হাতে দিয়ে বললে, এতেই সব লেখা আছে। কিন্তু ধীরাবাবু, মিথ্যে রঙ চড়াবেন না যেন। একতারায় যেমন সুর ওঠে, তেমনই বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয়, তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি, যেমন লাগুক, দোসরা রঙের আঁচড় দেবেন না।—এই পাঠশালার পণ্ডিত।

কথা শেষ করে পণ্ডিত চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ধীরানন্দ বললে, পণ্ডিত, আমি তা হ'লে উঠি?

পণ্ডিতও উঠে দাঁড়াল। ধীরানন্দ আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

সীতারাম হঠাৎ বললে, আর একটা কথা ধীরাবাবু। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

বল পণ্ডিত।

আমাকে হাত ধ'রে উপরে নিয়ে যাবেন? সেখানে বলব, সেখানে দেখাব।

ধীরানন্দ তাকে ধ'রে নিয়ে গেল উপরে।

পণ্ডিত ইশারায় ইশারায় তাকের কাছে গেল। ডাকলে, ধীরাবাবু!

পণ্ডিত।

আমার পাপ—এ পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করুন আপনি।

কি পণ্ডিত ?

এই বইগুলি আপনার। আমি পড়তে নিয়ে এসে আর ফেরত দিই নাই। এইগুলি—এইগুলি নিয়ে যান। ধীরাবাবু!

ধীরানন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে এসে পণ্ডিতকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভীরু দুর্বল হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে দারিদ্র্যশীর্ণ বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে। আবেগ-প্রাবল্য জ্বরোত্তপ্ত উষ্ণতায় উষ্ণ। ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে মুক্ত দ্বারপথে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মিতে ঝলমল পশ্চিমে আকাশের দিকে। ঠোঁট কাঁপছে যেন এক অসহনীয় জ্বরজর্জরতায়।

ধীরানন্দ গভীর স্বরে শুধু বললে, জয় হোক, জয় হোক—পণ্ডিত, তোমার জয় হোক। ধীরানন্দের আলিঙ্গনের মধ্যে কখন তার চশমাটা খ'সে প'ড়ে গিয়েছিল।

সীতারাম ডাকলে, রত্না! একটা আলো দিয়ে যা মা। ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল!

যাই বাবা। রত্না সাড়া দিলে।

ধীরানন্দ সবিস্ময়ে বললে, এ কি পণ্ডিত, তুমি কি কিছুই দেখতে পাও না? ঘরে তো আলো রয়েছে এখনও।

সীতারাম হেসে বললে, আলো রয়েছে? ও, চশমাটা খ'সে প'ড়ে গিয়েছে কিনা! দেখুন তো ধীরাবাবু নইলে আমিই হয়তো পা দিয়ে ভেঙে ফেলব।

ধীরানন্দ চশমাটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলে। চশমাটা চোখে দিয়ে সীতারাম বললে, এতেও ঝাপসা সব।

ধীরানন্দ তার হাত ধ'রে বললে, পণ্ডিত, তুমি আমার সঙ্গে চল, চোখের চিকিৎসা করাবে।

সীতারাম ঘাড় নাড়লে, না। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কি দেখব চোখ নিয়ে? রত্নার বিধবা মূর্তি? থাক্।

স্তব্ধ হয়ে গেল দুজনে।

রত্না আলো দিয়ে গেল।

পণ্ডিত বললে—এবার তার কণ্ঠস্বরের সুর আলাদা—বললে, ধীরাবাবু, আর দিকে ভাল হয়েছে। ইষ্টদেবকে দেখতে পাই ভেতরে। আর—। হাসবেন না যেন। ব'সে থাকি আর ভাবি। ভাবি নয়, দেখতে পাই। সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা যায় ইস্কুলে, আমি দেখি তাদের যে চেহারা নয়, সেই চেহারা দেখি। আটটি দশটি ছেলের পায়ের শব্দ শুনতে পাই, আমি ভাবি, চোখেও যেন দেখি, গ্রামের সব ছেলেমেয়ে চলছে পাঠশালায়। মোটাসোটা চেহারা, ঝকমকে চোখ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে চলছে সব পাঠশালায়। ফ্রী ইউ পি. পাঠশালা, দেখি ঘরের পর ঘর বেড়ে চলেছে—হুগলির সব ব্যারাক দেখেছিলাম, সেইরকম সারি সারি ঘর। তার মধ্যে পাঠশালার পণ্ডিত একজন দুজন নয়, দশজন বিশজন। তারা আমাদের মত দুঃখী নয়, আমাদের মত কম-লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত নয়, তারা পড়াচ্ছে তাদের। তাদের মাইনে হয়েছে, দশ টাকা পনরো টাকা নয়, তিরিশ চল্লিশ টাকা, দেশে খাতির হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সবচেয়ে বড় মানুষ বললে তাদের আর সাজা হয় না। ছেলেরা পড়ছে, নামতা বলছে, লাফালাফি ছুটোছুটি করছে। দেশের সব—সব ছেলে পড়ছে। রত্নহাটের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, মুসলমান, আমার সন্দীপনে যাদের পাড়ার ছেলেরা পড়ত, সাহু, স্বর্ণকার, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি সবারই ছেলে—সব পড়ছে সুর ক'রে ক'রে।

একটু থেমে সে আবার বললে, অন্ধ চোখে আমি তাই ভাবি, তাই দেখতে পাই। ধীরাবাবু, আমি তাই দেখতে পাই।

ধীরানন্দ, সীতারামের অন্ধ দৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করলে।

চবি দীনবন্ধু লেন, পরিচয় প্রেসের পক্ষে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, ভারতী-ভবনের পক্ষে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
কর্তৃক প্রকাশিত